রবিকাহিনী

অমিতাভ চৌধুরী

ছবি

দেবব্রত ঘোষ

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

উৎসর্গ

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

শুভ্রা মুখোপাধ্যায়

মুখবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত বই 'কবিকাহিনী'। তারই অনুকরণে এই বইয়ের নাম দিলাম 'রবিকাহিনী'। শুধু কবি নন, এমনকি নাট্যকার প্রবন্ধকার ঔপন্যাসিক গল্পলেখকও নন, রবীন্দ্রনাথ আরও কিছু। এই বইয়ে আমি জোর দিয়েছি তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক মতামতকে। যদিও তিনি বলেছেন, তাঁর পরিচয় একমাত্র 'কবি', কিন্তু আমরা জানি, এ কথা সর্বাংশে সত্য নয়। তাছাড়া সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহুবার আলোচনা হয়েছে, হচ্ছেও; তাই আমি গুরুত্ব দিয়েছি অন্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে। সেই ছোটবেলা থেকে বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত দেশের নানা ঘটনা তাঁকে আলোড়িত করেছে, তিনি তাঁর মতামত জানিয়েছেন দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে বা প্রবন্ধ লিখে। বাল্যে হিন্দুমেলায় যে স্বাদেশিকতার দীক্ষা নিয়েছিলেন, তাই অক্ষুণ্ণ ছিল বাকি জীবন। সেকালের তিন প্রধান রাজনৈতিক পুরুষ—মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠতা। গান্ধীজির সঙ্গে মতান্তর ঘটেছে বহুবার, কিন্তু মনান্তর হয়নি কখনও। জওহরলালকে বলেছেন 'ঋতুরাজ' এবং সুভাষচন্দ্রকে বলেছেন 'দেশনায়ক'। রবীন্দ্রনাথের লেখা বেশ কিছু বই উল্লেখ করেছি প্রসঙ্গক্রমে। বিস্তারিত আলোচনা করিনি, কারণ তা সবারই মোটামুটি জানা। তবে রবীন্দ্রনাথের লেখা সব বইয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা দিয়েছি পরিশিষ্টে। লিখতে গিয়ে প্রভূত সাহায্য নিয়েছি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'রবীন্দ্রজীবনী' থেকে। তাঁর কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টকে ধন্যবাদ, বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্যে।

অমিতাভ চৌধুরী

এক

আশী বছরের দীর্ঘ জীবন। অনেক আনন্দ, অনেক শোক। তার মধ্যেই সৃষ্টি। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যে-ছেলেটি ১৮৬১ সালে জন্মেছিল, সে-ই মুখ উজ্জ্বল করে পরিবারের, বাংলার, সারা ভারতের। পিতা এবং পিতামহ—দু'জনেই খ্যাতিমান। পরিবারের অন্য অনেকেও তাই, তবু তাঁদের সবাইকে ছাপিয়ে ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের নাম। তাঁকে চিনতে হলে, তাঁকে জানতে হলে পরিচয় থাকা চাই সমসাময়িক ইতিহাসের সঙ্গে; তাকাতে হবে তাঁর পূর্বপুরুষদের দিকে। যশোহর জেলা থেকে একটি মানুষ কী করে আদি কলকাতায় এলেন, প্রচুর ধনসম্পত্তি করলেন, সারা বাড়ি আলোকিত করলেন তাঁর উত্তরপুরুষেরা, সেই কাহিনী যেমন আকর্ষক, তেমনি চমকপ্রদ। রবীন্দ্রনাথ থেকে সাত পুরুষ আগেকার পঞ্চানন দিয়েই এই কাহিনীর সূত্রপাত।

যশোর জেলা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন পঞ্চানন কুশারী। ভাগ্যান্বেষণে। তখন সবে ইংরেজরা এ-দেশে বাণিজ্যের সূত্রপাত করেছে। জোব চার্নক নামে এক ইংরেজ আসেন ১৬৯০ সালে। তার কয়েক বছর পরেই যশোরের পিঠাভোগ নামক গ্রাম থেকে কুশারীমশাই এসে হাজির হন পুজো আর্চা ইত্যাদি করাতে সুতানুটি অঞ্চলে, গঙ্গার ঘাটে। লোকেরা তাঁকে ডাকত 'ঠাকুরমশাই' বলে—যেমন অন্য আরও দশজন ব্রাহ্মণকে ডেকে থাকে। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে গেল পঞ্চানন ঠাকুর। পরে তাঁর উত্তরপুরুষের পদবীও হল তাই।

পুজোআর্চার ফাঁকে এই ঠাকুরমশাই ঘাটে লাগানো জাহাজের কাপ্তেনদের সঙ্গে টুকিটাকি লেনদেনের ব্যবসাও শুরু করে দিলেন। আসতে লাগল বেশ দু'চার পয়সা। কয়েক বছর পর দেখা গেল তিনি প্রচুর টাকার মালিক। এখন যেখানে ফোর্ট উইলিয়াম, সেখানে বানালেন একখানি বাড়ি। কিন্তু

মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দি খাঁর সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ লাগার পর ওইখানেই তৈরি করতে হয় ফোর্ট উইলিয়াম। সেখানকার বাসিন্দাদের প্রচুর টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে সরানো হল উত্তরে। ঠাকুররা গেলেন পাথুরিয়াঘাটায়।

পঞ্চাননের ছেলে জয়রাম। তিনি ছিলেন সরকারি আমিন। আরও পয়সা এল ঘরে। তাঁর ছেলে নীলমণি। নীলমণির ছোটভাই দর্পনারায়ণ। ভাইয়েরা অগাধ টাকার মালিক, তাই পারিবারিক বিবাদও শুরু হল। নীলমণি আলাদা হয়ে জোড়াসাঁকো এলাকায় বসতি স্থাপন করলেন। বিরাট বাড়ি বানালেন ১৭৮৪ সালে। সেটিই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি (পরে মহর্ষি ভবন) নামে আজও খ্যাত।

নীলমণির বড় ছেলে রামলোচন। প্রভাবশালী ও সম্পদশালী লোক। সম্পত্তি তিনি বাড়িয়েই গেলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অপুত্রক। তাই ছোটভাই রামমণির দ্বিতীয় ছেলে দ্বারকানাথকে দত্তক নিলেন। দ্বারকানাথের জন্ম ১৭৯৪ সালে। অসাধারণ তেজস্বী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্ব। ভূ-সম্পত্তি বাড়ালেন, ব্যবসা বাড়ালেন, কয়লার কারবার খুললেন, কার টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলেন; মধ্যবঙ্গে ও ওড়িশায় জমিদারির পর জমিদারি কিনে তিনি হলেন কলকাতা শহরের সবচেয়ে বড় ধনী ও সম্মানিত ব্যক্তি। ১৮৪২ সালে প্রথম বার বিলেত গিয়ে ইংল্যাণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালেন। রানী তাঁকে বলতেন—'মাই প্রিন্স'। তারপর থেকেই তিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ। অন্যান্য গুণিজনদের মধ্যে কথাসাহিত্যিক চার্লস ডিকেন্স হলেন তাঁর বন্ধু। সেকালের অন্য সব সাহিত্যিক শিল্পী ও প্রভাবশালী ইংরেজরা তাঁর সঙ্গে হলেন ঘনিষ্ঠ। ফ্রান্স ও জার্মানিতে গিয়েও তিনি পান প্রচুর রাজসম্মান। ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় প্যারিসে। দেশে ফিরে এসে ১৮৪৫ সালে আবার ইংল্যাণ্ড যান। ১৮৪৬ সালে ইংল্যাণ্ডেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্বারকানাথের বড় ছেলে দেবেন্দ্রনাথ। যৌবনে বিলাসিতায় কাটালেও তাঁর মন পরে আধ্যাত্মিকতার দিকে চলে যায়। তাই তাঁকে বলা হয় মহর্ষি। দীর্ঘ জীবনে অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন এবং ব্রাহ্ম ধর্মের প্রসার ও প্রচার হয়েছে মূলত তাঁরই হাতে। তিনিই ছিলেন প্রাণপুরুষ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ, সমাজ সংস্কার ও বাংলা সাহিত্য সেবায় তাঁর দান অপরিসীম।

তিনি অসাধারণ বাংলা গদ্য লিখতেন। ভাষার গুণে তাঁর আত্মজীবনী বারবার পড়ার মত। শুধু ব্রাহ্ম সমাজের নেতা তিনি ছিলেন না, ছিলেন হিন্দু সমাজেরও। অনেকে বলেন, তাঁকে 'মহর্ষি' না বলে 'রাজর্ষি' বলা উচিত। ভগবদ্‌চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজচিন্তা ও পারিবারিক চিন্তা তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে সমাধা করতে পেরেছিলেন। তাঁর বহু সন্তানবতী স্ত্রী সারদাসুন্দরী ছিলেন গুণবতী মহিলা।

তাঁর পুত্রদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সেকালের বুধমণ্ডলীর অগ্রগণ্য। কন্যা স্বর্ণকুমারীও সেকালের নামী লেখিকা। তাছাড়া তাঁর ছোট ভাই গিরীন্দ্রনাথের পৌত্র গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ শিল্প জগতে যুগান্তর আনেন। দেবেন্দ্রনাথের আর এক পৌত্র বলেন্দ্রনাথও বাংলা গদ্যের প্রধান লেখক। মোটকথা,

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি সেকালের কলকাতার একটি অগ্রগণ্য পরিবার। সাহিত্যে সংগীতে ও সংস্কৃতিচর্চায় এবং ধনে মানে অনেকের চেয়ে এগিয়ে ছিল। এই পরিবারের লোকেরাই নবযুগের উদয় ঘটান চলনে বলনে ও মননে।

রবীন্দ্রনাথ জোড়সাঁকোর এই ঠাকুর পরিবারের, মা-বাবার চতুর্দশ সন্তান। শেষ সন্তান বুধেন্দ্রনাথের অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়াতে তিনিই হয়ে যান কনিষ্ঠ সন্তান। ১৮৬১ সালের ৬ মে তিনি জন্মগ্রহণ করেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি আলো করে। ঠিক ওই বছরে এবং ওই দিনেই জন্ম নেন আর একজন খ্যাতিমান ভারতীয়—পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু যাঁর ছেলে জওহরলালের সঙ্গে পরে ঘনিষ্ঠতা হয় রবীন্দ্রনাথের।

রবীন্দ্রনাথ যখন জন্ম নিয়েছেন, তখন বাঙালীর সমাজে ও জীবনে নানাভাবে মুক্তির আহ্বান এসেছিল। তাছাড়া জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি যেমন ছিল বিশাল, তেমনি বিচিত্র।

দাসদাসীদের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার বেশি সময় কাটে। তাই তিনি এই পর্বকে বলেছেন 'ভৃত্যরাজকতন্ত্র।' ভৃত্যদের হাতে প্রায় বন্দিজীবন কাটানোর সময় তাঁর সঙ্গী ছিল খোলা জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের শোভা। আর সঙ্গী ছিল বাড়ির বারান্দার রেলিং। একটি ছোট্ট ছড়ি হাতে রেলিংগুলোকে ছাত্র বলে কল্পনা করতেন 'মাস্টার' রবীন্দ্রনাথ।

বাড়িতে ছিল সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যের আবহাওয়া। কেউ লিখছেন কবিতা বা নাটক, কেউ লিখছেন গান, কেউ বাজাচ্ছেন পিয়ানো। বাঁধা গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদুভট্ট গান শেখাচ্ছেন ছোটদের ও বড়দের। বাইরে চলছে কুস্তি ডন বৈঠকের পালা। ঘোড়ায় চড়ে ময়দানে যাচ্ছেন দাদা-বৌদিরা। শিশুকাল থেকে রবীন্দ্রনাথ সুকণ্ঠ। তিনি নিজেই বলেছেন, কুস্তি ও পড়াশোনার ফাঁকে—"কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না, তাহা মনে পড়ে না।"

বালক রবীন্দ্রনাথের জন্য নানা বিদ্যার আয়োজন করা হয় সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে। বাড়িতে আসতেন বেশ কয়েকজন গৃহশিক্ষক, তাছাড়া তাঁকে ভর্তি করানো হয় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি নামক স্কুলে। স্কুলটি ভালো না লাগায় পরে ভর্তি হন বেঙ্গল অ্যাকাডেমি ও নর্মাল স্কুলে। সেণ্ট

জেভিয়ার্স স্কুলেও কিছুদিন ছিলেন কিন্তু কোন স্কুলই তাঁর মনঃপূত হয়নি। ফলে বাড়িতে গৃহশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা চলতে থাকে মন্থর গতিতে। তার মধ্যে সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা দেখান পড়তে বসে। কুমারসম্ভব কাব্য ও ম্যাকবেথ নাটকের বাংলা অনুবাদও শুরু করেন সেই বালক বয়সে। তাছাড়া বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের লাইব্রেরি থেকে বিবিধার্থ সংগ্রহ ও অবোধবন্ধু পত্রিকা পড়ে বালক রবি মুগ্ধ হয়ে যায়। তেমনি মুগ্ধ হন পরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকা পড়ে।

১৮৭৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তাঁর উপনয়ন হয়। তারপর যান হিমালয় বেড়াতে বাবার সঙ্গে। পথে শান্তিনিকেতন। সেখানে এক তালগাছের গোড়ায় বসে 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' নামে একখানি কাব্যও রচনা করেন। কাব্যটি রচনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যায়। বোলপুর থেকে বেরিয়ে ট্রেনে সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর ইত্যাদি জায়গায় থেমে থেমে পিতাপুত্র পৌঁছন অমৃতসরে। সেখানে শিখ ভজন, অখণ্ড গ্রন্থসাহেব পাঠ শুনে দুজনে চলে যান ডালহৌসি পাহাড়ে। বক্রোটার শিখরে ছিল পিতাপুত্রের বাসা। এই হিমালয় দর্শন কবির মনের ব্যপ্তি বাড়িয়ে দেয়। পিতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও গভীরতর হয়।

বাল্যে রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর রেখাপাত করে হিন্দুমেলা। তেরো বছর আট মাস বয়সে রবীন্দ্রনাথ এই মেলা উপলক্ষে একটি কবিতাও লেখেন—হিন্দুমেলার উপহার। এই প্রথম ছাপা কবিতাটি বের হয় বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকায়। তার আগে 'অভিলাষ' নামে তাঁর আর একটি কবিতাও ছাপা হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতার শিক্ষা সারা দেশে শুরু সেই প্রথম। নবগোপাল মিত্র ও তাঁর খুড়তুতো দাদা গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে এই মেলা শুরু হয়। সেই সময় আর একটি গুপ্তসভা স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষা দিত। রবীন্দ্রনাথ সেই সভার সদস্য ছিলেন। সভাটি হল সঞ্জীবনী সভা। একটি গুপ্ত ভাষায় তাকে 'হামচুপামুহাফ' বলা হত। স-কে হ, হ-কে স এবং বর্ণের প্রথমকে তৃতীয়, তৃতীয়কে প্রথম ইত্যাদি করে কথাবার্তা বলা হত সেই গুপ্তসভায়। রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় যুক্ত থেকে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন। এই সময় 'দিল্লি-দরবার' নামে তিনি একটি কবিতা লেখেন, কিন্তু ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের দরুন

কবিতাটি তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

ইতিমধ্যে কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু নামডাক হচ্ছে। 'বনফুল' ও 'কবিকাহিনী' প্রকাশিত হয়েছে। যদিও 'বনফুল' আগে লেখা, কিন্তু 'কবিকাহিনী' প্রকাশিত হয় সর্বপ্রথম। দু' চারটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। তারই মধ্যে হঠাৎ চলে গেলেন ইংল্যাণ্ড—ব্যারিস্টারি পড়তে। কিন্তু ব্যারিস্টারি পরীক্ষা না দিয়েই ফিরে আসেন।

দেশে ফিরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহযোগিতায় লিখলেন বাল্মীকি প্রতিভা নামে গীতিনাট্য, তারপর কালমৃগয়া। অসাধারণ সাফল্যের পর নানা রচনায় হাত দিলেন। লিখলেন রুদ্রচণ্ড, সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত এবং ছবি ও গান। সেই সময়েই লেখা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' নামে একটি কবিতা কবির মনের দুয়ার খুলে দেয়। এই কবিতাটিকে তিনি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন।

ইতিমধ্যে তাঁর মায়ের মৃত্যু ঘটে। তারও চেয়ে বড় দুঃসংবাদ, কয়েক বছর পর তাঁর কাব্যজীবনের প্রেরণাদাত্রী নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু। এই ভদ্রমহিলা রবীন্দ্রনাথের মননে বিশেষ সাক্ষ্য রেখে গেছেন। তাঁকে নিয়ে পরে বহু কবিতা ও গান রচনা করেছেন।

১৮৮২ সালে কবির বিবাহ হয় মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে। খুলনার একটি সাধারণ ঘরের মেয়ে হয়েও তিনি কবিজীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছেন। ১৯০২ সালে মাত্র আঠাশ বছর বয়সে কবিপত্নীর মৃত্যু হয়। তাঁর দিকে সন্তান সংখ্যা পাঁচ। জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার বিয়ে হয় মজঃফরপুরে—কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে। তাঁরা নিঃসন্তান ছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথের বিয়ে হয় অবনীন্দ্রনাথের বোন বিনয়নী দেবীর কন্যা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে। তাঁরাও নিঃসন্তান। মধ্যমা কন্যা রেণুকাও তাই এবং কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় বালক বয়সে। কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবীর ছিল এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র নীতিন্দ্রনাথের মৃত্যু মাত্র ১৯ বছর বয়সে জার্মানিতে এবং কন্যা নন্দিতার বিবাহ হয় কৃষ্ণ কৃপলানীর সঙ্গে। তাঁরাও নিঃসন্তান ছিলেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বংশধর কেউ আর নেই। রথীন্দ্রনাথ অবশ্য 'নন্দিনী' নামে একটি গুজরাতি মেয়েকে পালিতা কন্যা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

বাড়িতে বরাবর সাহিত্যের আবহাওয়া ছিল। বাড়ি থেকে একটি সাহিত্য মাসিক প্রকাশিত হয়। নাম 'ভারতী', সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ষোল বছর বয়স তখন রবীন্দ্রনাথের। কাগজে রবীন্দ্রনাথ লিখতে শুরু করলেন। মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যকে আক্রমণ করে লেখা তাঁর প্রবন্ধ আলোড়ন তোলে। 'ভিখারিণী' নামে একটি গল্পও লেখেন। ওই সময় 'ভানুসিংহের পদাবলী' নাম দিয়ে ব্রজবুলিতে কয়েকটি গানও রচনা করেন। তাছাড়া ভারতী পত্রিকায় গ্যয়টে, দান্তে, পেত্রার্ক প্রভৃতি ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধও রচনা করেন।

দুই

১৮৮৪ সালে অসাধারণ বাগ্মী ও নববিধান ব্রাহ্মদের নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মারা যান। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর অপার ভগবদ্ ভক্তির জন্যে কলকাতা শহরে বহু আলোচিত নামী লোক। রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সখ্য না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের মধ্যে সম্পর্ক ছিল। বেশি ছিল অবশ্য ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে কবির। এই সময়ই শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিয়ে কতকগুলি আজগুবি মতামত সাধারণ লোকদের মধ্যে চালাচ্ছিলেন। তাঁরা হাঁচি-টিকটিকিরও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন। এঁদের কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'হিং টিং ছট' কবিতাটি।

এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কবির মসিযুদ্ধ চলে। রবীন্দ্রনাথ তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকও। বঙ্কিমবাবু সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ লেখকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বঙ্কিমবাবু ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী ও হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এই সময়ই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর অসাধারণ কথা কাটাকাটি হয় কাগজে। এই বঙ্কিমবাবুই অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী ছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার বিবাহের সময় নিজের গলার মালা দিয়ে সন্ধ্যাসংগীতের কবিকে অভ্যর্থনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কবির হৃদ্যতা আমৃত্যু ছিল। ওই মসিযুদ্ধটা ছিল সাময়িক।

এদিকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কয়েকজন বালক বড় হয়ে কবির সঙ্গী হয়েছে। যেমন বলেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ, এবং অবনীন্দ্র সমরেন্দ্র ও গগনেন্দ্র—তিন ভাই। এই সময় তাঁর মেজবৌঠান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'বালক' নামে একটি পত্রিকা ঠাকুরবাড়ি থেকে বের করেন। ছোটদের জন্যে এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত লিখতে লাগলেন গল্প কবিতা নাটক হাস্যকৌতুক। 'শিশু' নামক কাব্যগ্রন্থের প্রথম কিছু কবিতা এই সময়েই লেখা। তাছাড়া লিখলেন রাজর্ষি ও মুকুট। এই সময় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক খ্যাতি বেড়েই চলেছে। কড়ি ও কোমল এবং মানসীর পর সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়ে কবি হিসাবে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, এবং মায়ার খেলা, বিসর্জন, চিরকুমার সভা ইত্যাদি বিভিন্নধরনের নাটক ও অজস্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে ক্রমে ক্রমে।

১৮৮৫ সালে পূজার ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল সোলাপুর গেলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তখন সেখানকার জজসাহেব। সেইখানে বসে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি অসাধারণ প্রবন্ধ লেখেন। লেখেন 'রাজা ও রানী' নামে নাটক। এই সময় কলকাতায় রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা বেড়েই চলেছে। ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন করারও আয়োজন চলছে। ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়।

ইতিমধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন জমিদার রবীন্দ্রনাথ। ১৮৯১ সালে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের ওপর জমিদারি পরিচালনার ভার দিয়ে পাঠালেন শিলাইদহ। পূর্ববঙ্গের বিরাহিমপুর কালীগ্রাম ও সাজাদপুর এবং ওড়িশার কয়েকটি পরগণা—যা ঠাকুর-জমিদারির অন্তর্ভুক্ত—দেখাশোনার ভার নিয়ে কবি নতুন কর্মযজ্ঞে মেতে উঠলেন। জমিদারি পরিচালনায় কবি সুনিপুণ কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সেই প্রথম বাংলাদেশের গ্রামকেও তিনি ভাল করে চিনলেন এবং গ্রামোন্নয়নে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চালু করে কৃষির উন্নতি করলেন। সেই সঙ্গে গান, কবিতা ছোটগল্প ও প্রবন্ধ অজস্র ধারায় প্রকাশিত হতে লাগল কবির কলমে। গ্রামীণ লোকদের সঙ্গে পরিচয় কবির মনের জানালা খুলে দিল। তার পরিচয় পাই সে যুগের বিভিন্ন লেখায়। বিশেষত ছোটগল্পে এবং 'ছিন্নপত্র' নামক বইয়ে।

তার আগে রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ সালের ১৫ মে ভারত সরকারের নানা নীতির সমালোচনা করে 'মন্ত্রী অভিষেক' নামে একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ পড়লেন। তাঁর বক্তব্য ছিল—'গবর্নমেণ্টের দ্বারা মন্ত্রী-নিয়োগ অপেক্ষা সাধারণ লোকের দ্বারা মন্ত্রী-অভিষেক অনেক কারণে আমাদের নিকট প্রার্থনীয় মনে হয়।'

ইতিমধ্যে জোড়াসাঁকো বাড়ি থেকে প্রকাশিত হতে লাগল 'সাধনা' নামে মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। গল্প প্রবন্ধ পুস্তক সমালোচনা ইত্যাদি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনাই বেশি থাকত কাগজে। ১৮৯২ সালে স্থাপিত হল ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ। এই সমাজে অভিনয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'গোড়ায় গলদ' নামে নাটক। তারই ফাঁকে জমিদারি দেখাশোনা। রাজশাহীতে দেখা হয় বন্ধু লোকেন পালিতের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ বিলেতে। তাঁর সাহচর্য কবির ভাল লাগে। রাজশাহী থেকে যান নাটোর—আর এক বন্ধু নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে।

সোলাপুর গিয়েছিলেন স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের নিয়ে। নিজে একা ফিরে এলেও বাড়ির লোকজনেরা ছিলেন মেজদাদার কাছে। মৃণালিনী দেবীদের জোড়াসাঁকোয় ফিরিয়ে এনে সংসার পাতলেন। জমিদারি দেখতে চললেন ওড়িশায়। সঙ্গে ভাইপো বলেন্দ্রনাথ। তিনি তখন সাহিত্যে কাকার সাকরেদি করছেন। কটকে এসে উঠলেন বিহারীলাল গুপ্তের বাড়িতে। কটকে থাকতেই এক ভোজসভায় স্থানীয় র‍্যাভেনশ কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। খাবার টেবিলে বসে ওই সাহেব ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধে এমন কতকগুলি মন্তব্য করেন, যা কবিকে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ করে। তিনি এই ঘটনার উল্লেখ করে পরে লিখেছেন—'একজন বাঙালীর নিমন্ত্রণে এসে বাঙালীর মধ্যে যারা এরকম করে বলতে কুণ্ঠিত হয় না, তারা আমাদের কী চক্ষে দেখে।' এই দিনের কথা স্মরণ করে 'অপমানের প্রতিকার' নামে একটি প্রবন্ধ কিছুদিন পরে লেখেন।

কলকাতায় ফিরে রাজনৈতিক আবর্তে জড়িয়ে পড়লেন। লিখলেন 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' নামে বিরাট এক প্রবন্ধ। বিডন স্ট্রীটের চৈতন্য লাইব্রেরিতে সেটা পড়লেনও। সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই শেষ সাক্ষাৎ। তার কিছুদিন পরেই বঙ্কিমের মৃত্যু

হয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথ কাব্যরচনা ছাড়াও আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লেখেন। যেমন ইংরেজের আতঙ্ক, সুবিচারের অধিকার, রাজা ও প্রজা, রাজনীতির দ্বিধা ইত্যাদি। এই সব প্রবন্ধে কবির দেশাত্মবোধ প্রকাশিত হয়েছে তীব্রভাবে। একজায়গায় তিনি লিখেছেন—'ইউরোপের নীতি কেবল ইউরোপের জন্য। ভারতবর্ষীয়রা এক স্বতন্ত্র জাতি যে ওই সভ্য নীতি তাহাদের পক্ষে উপযোগী নহে।' তাঁর মতে 'ইংরেজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকটকর্তব্য সকল পালনে একান্ত মনে নিযুক্ত হওয়া ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে বিদ্বেষ শমিত করার উপায়।'

ভারতের রাজনীতির মধ্যে এই সময় সাম্প্রদায়িকতা প্রবলভাবে প্রবেশ করে। হিন্দু-মুসলমানের সমাজজীবনেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মহারাষ্ট্রে লোকমান্য টিলকের নেতৃত্বে হিন্দু জাতীয়তা আন্দোলনের জন্ম হয়। শিবাজী উৎসব, গণপতি পূজা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবোধ

জেগে ওঠে। গোরক্ষিণী সভাও স্থাপিত হয়। কিছুদিনের মধ্যে মুসলমানের পক্ষে ধর্মের জন্য গোবধ আবশ্যক এবং হিন্দুর পক্ষে ধর্মরক্ষার জন্য গোবধ নিবারণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ফলে গরু মারতে ও গরু বাঁচাতে গিয়ে রক্তারক্তি শুরু হল এবং বহু লোক মারা যেতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ খুব আশা নিয়ে বলেছিলেন যে এই সব আঘাতে হিন্দুর সর্বশ্রেণীর মন ক্রমশ পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হবে।

গত শতাব্দীর শেষ দশকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বৎসরেই তিনি এবং কবি নবীনচন্দ্র সেন সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি দেশের লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও গবেষণা নিয়ে শিক্ষিতজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং 'সাধনা' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধও লেখেন এই সম্পর্কে। এই সময়ই তিনি বাংলার ছড়া সংগ্রহে মন দেন। চৈতন্য লাইব্রেরিতে 'মেয়েলি ছড়া' নামে এক প্রবন্ধ পড়ে শিক্ষিতজনের কাছে একটি নতুন দিক খুলে দিলেন। লোকসাহিত্যের মধ্যে সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতা তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

কখনও জমিদারিতে, কখনও কলকাতায় যাতায়াত করতে করতে ক্লান্ত কবি কিছুদিনের জন্য শান্তিনিকেতনের দোতলা বাড়িতে গিয়ে রইলেন। সেখানে বিশ্রাম নিয়ে ফিরলেন আবার কলকাতায়। ভার নিলেন 'সাধনা' পত্রিকা সম্পাদনার। তাছাড়া লেখালেখির কাজ তো চলছেই। 'সাধনা' পত্রিকায় লেখেন বহু ছোটগল্প ও প্রবন্ধ। আর 'পঞ্চভূতের ডায়রি'। এক সময় জমিদারি দেখাশোনার সঙ্গে শুরু হল ব্যবসায়। পাট চাষ আখমাড়া কল বসানো, ভুষিমালের কেনাবেচা ইত্যাদি। তারই মধ্যে লেখেন 'চিত্রা' কাব্যের উৎকৃষ্ট কয়েকটি কবিতা। উর্বশী, বিজয়িনী, স্বর্গ হইতে বিদায়, সিন্ধুপারে ইত্যাদি। তাছাড়া সাধারণ মানুষের কথা যেমন বলেছেন নানা গল্পে, তেমনি তাদের ছবি আঁকলেন 'চৈতালি' নামক কাব্যগ্রন্থে।

১৮৯৭ সালে রাজশাহী জেলার নাটোরে মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের আমন্ত্রণে হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন। সেখানে কংগ্রেসের মান্যগণ্য প্রতিনিধি ছাড়াও ঠাকুরবাড়ির অনেকে ছিলেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ, যেমন অবনীন্দ্রনাথ। সভাপতি ছিলেন ঠাকুরবাড়িরই সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি এবং ডব্লু. সি. ব্যানার্জি প্রমুখ নেতারা ইংরেজিতে ভাষণ দিতে শুরু

করলে রবীন্দ্রনাথ দর্শক আসন থেকে ক্রমাগত দাবি তুলতে থাকেন—'বাংলায় বলতে হবে।' কিন্তু ভীষণ ভূমিকম্পে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। নেতারা সব প্রাণ নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন, তবে বাংলা ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা হয় সেদিনের জনসভাতেই।

১৮৯৮ সালে 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনার ভার পড়ে কবির ওপর। ইতিমধ্যে তিনি লিখে ফেলেছেন 'চিত্রাঙ্গদা', 'গান্ধারীর আবেদন', 'নরকবাস', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ইত্যাদি কাহিনী-কবিতা। ওদিকে 'ভারতী'র ভার পেয়ে কবির লেখাও বেড়ে গেল। গল্প কবিতা প্রবন্ধ ইত্যাদি। সেই সময় মহারাষ্ট্রে প্লেগের উপদ্রব শুরু হয়। বিপ্লবী চাপেকর-ভাইরা গুলি করে মারেন প্লেগ অফিসার ও ম্যাজিস্ট্রেটকে। বালগঙ্গাধর টিলককে গ্রেপ্তার করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তারই প্রতিবাদে 'কণ্ঠরোধ' নামে একটি কড়া প্রবন্ধ পাঠ করেন টাউন হলের বিরাট সভায়। টিলক মহারাজের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতা ছিল। টিলক চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে বিলেত পাঠাতে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করতে। দু'জনে একসময় রাজনৈতিক ভাবে খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। কিছুদিন পরে ঢাকায় প্রাদেশিক সম্মেলনে কবি গান করেন ও সভাপতি রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজি ভাষণ সভাতেই বাংলায় করে দেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু কবির বন্ধু। কবির অনুরোধে ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য জগদীশচন্দ্রকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেন বিলেতে গবেষণা চালাবার জন্যে। ১৯০১ সালে প্রকাশিত হতে থাকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বঙ্গদর্শন নবপর্যায়। রবীন্দ্রনাথ তার সম্পাদক নিযুক্ত হন। সেই কাগজেই লিখতে শুরু করেন 'চোখের বালি' নামে উপন্যাস। সেই প্রথম বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। তার পরেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'নষ্টনীড়' নামে অসাধারণ একটি গল্প। 'নৈবেদ্য' নামে ভক্তিমূলক কবিতাবলীও এই সময়েই লেখা।

কলকাতায় ফিরে এসে বড় মেয়ে মাধুরীলতা ও সেজ মেয়ে রেণুকার বিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। ১৯০১ সালে ডিসেম্বরে অর্থাৎ ১৩০৮ সালে ৭ পৌষ বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হল। শিলাইদহ কুঠিবাড়ির শিক্ষকরা এলেন এবং অধ্যাপকরূপে

এলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদ নামে এক সিন্ধি যুবক। প্রথমে ছিলেন পাঁচজন ছাত্র। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' ডাকা শুরু করলেন ব্রহ্মবান্ধব, পরে এই ডাক বহুল প্রচলন করেন মহাত্মা গান্ধী। ব্রহ্মবান্ধব চলে গেলে হেডমাস্টার হয়ে আসেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধায়। প্রাচীন তপোবনের আদর্শে বিনা বেতনে আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা। নগ্নপদ মুণ্ডিতমস্তক নিরামিশাষী ছাত্ররা ছিলেন আশ্রমের অধিবাসী।

বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের খরচ রবীন্দ্রনাথ গোড়ায় চালিয়েছিলেন স্ত্রীর দেওয়া গয়না বিক্রি করে। মৃণালিনী দেবী ছিলেন আশ্রম-জননী। সব ছাত্রের দেখাশোনা খাওয়াদাওয়ার ভার তিনি নিজে নিয়েছিলেন। কিন্তু স্ত্রী হলেন গুরুতর অসুস্থ। তাঁকে নিয়ে কবি এলেন কলকাতায়। কিন্তু মৃণালিনী দেবী জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সব ফেলে চলে যান। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্মরণে কয়েকটি কবিতা লেখেন। সেগুলি 'স্মরণ' নামে কাব্যগ্রন্থে গ্রথিত। কিছুদিন পর সেজমেয়ে রেণুকারও মৃত্যু হল। আলমোড়ায় যখন অসুস্থ রেণুকাকে নিয়ে কিছুদিন ছিলেন তখন 'শিশু' পর্যায়ে আরও কিছু কবিতা লেখেন। ওদিকে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার জন্যে নিয়মিত 'নৌকাডুবি' উপন্যাসটি লিখে চলেছেন।

শান্তিনিকেতনে নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি সম্পর্কে কবির মনে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। নতুন হেডমাস্টাররূপে কবি নিয়ে এলেন মোহিতচন্দ্র সেনকে। ছাত্রসংখ্যাও বাড়ছে। কিন্তু মোহিতচন্দ্র সেনের স্বাস্থ্য ভেঙে যাওয়ায় তিনি

বিদায় নিলেন। তাঁর জায়গায় এলেন ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, তিনি হাল ধরলেন কিছুদিন। কিন্তু তিনিও বেশিদিন রইলেন না। এইভাবে চলতে লাগল কবির ইস্কুল। ক্রমে ক্রমে অধ্যাপক রূপে এলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, কালীমোহন ঘোষ, সি. এফ. এণ্ড্রুজ, উইলি পিয়ার্সন, অসিত হালদার, নন্দলাল বসু, নেপালচন্দ্র রায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পড়াশোনা ছবি আঁকা ও গান শেখানোয় আশ্রম জমে উঠল। ১৯২১ সালে হল বিশ্বভারতী। দেশ বিদেশ থেকে এলেন নামী পণ্ডিতের দল। সিলভ্যাঁ লেভি ভিনটারনিৎস স্টেন কোনো বেনোয়া বগদানফ তুচ্চি প্রমুখ বিদেশী মনীষীরা এলেন অতিথিঅধ্যাপক হয়ে। ১৯৪১ সালে কবির মৃত্যুর পরও প্রতিষ্ঠানটি গৌরবের সঙ্গে বহমান। ১৯৫১ সালে সমস্ত দায়িত্ব নিল ভারত সরকার প্রধানত মৌলানা আজাদ ও জওহরলাল নেহরুর চেষ্টায়। এবং অতি অবশ্য মৃত্যুর আগে মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শে।

তিন

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফিরে যাওয়া যাক। ১৯০৪ সালে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন। তিনি বঙ্গবিভাগের আয়োজন করলেন। ভাগাভাগিটা হল সাম্প্রদায়িক, দেশে প্রতিবাদ শুরু হল, রবীন্দ্রনাথ মুখ্য ভূমিকা নিলেন। 'স্বদেশী সমাজ' নামে একটি ভাষণ পাঠ করলেন। তিনি বললেন, গ্রামের দিকে ফিরে তাকাও, সেখানেই দেশের প্রাণশক্তি। এই গ্রামকে বাঁচাতে হবে, সেখানে সঙ্ঘশক্তি জাগাতে হবে।

১৯০৫ সালে বিদায় নিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। পরিণত বয়সে। তাঁর মৃত্যুর পর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বাঁধন নড়বড়ে হয়ে গেল, দ্বিজেন্দ্রনাথ পাকাপাকিভাবে চলে এলেন শান্তিনিকেতন। সত্যেন্দ্রনাথ আগে থেকেই আলাদা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিছুদিন পর চলে গেলেন রাঁচি। সেখানে তাঁর বাড়ি হল মোরাবাদী পাহাড়ে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত রইলেন শান্তিনিকেতনে। মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকো আসেন, শিলাইদহে যান।

ওদিকে ভারত সরকারের ইস্তাহার অনুসারে ১৯০৫ সালের ১৬

অক্টোবর বঙ্গবিভাগ ঘোষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে লিখলেন গান—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল—
পুণ্য হউক পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন পত্রিকায় লিখলেন, 'আগামী ৩০ আশ্বিন (১৩১২) বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙালীর রাখিবন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব। রাখিবন্ধনের মন্ত্রটি এই—ভাই ভাই এক ঠাঁই।'

কলকাতায় যে উৎসব হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ যোগ দিয়েছিলেন, শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন এবং সকলের হাতে রাখী পরিয়ে দেন। এই সময়ই ফেডারেশন হলের শিলান্যাস হয়। রবীন্দ্রনাথের লেখা গান গাইতে গাইতে মিছিল করে চলেন নগরবাসী—

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি
এমন শক্তিমান,
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে
এমন অভিমান।

তারপর শুধু গান বা মিছিল নয়, বিলাতি সব জিনিসের বয়কট শুরু হল। ইংরেজ সরকার এক সার্কুলার জারি করে স্কুল কলেজের ছাত্রদের এই স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়া বন্ধ করে দিতে চাইলেন। তখনই জনসাধারণ সভা করে প্রস্তাব নেয়—গভর্নমেন্টের বিশ্ববিদ্যালয় এবং গভর্নমেন্টের চাকরি দুটিই ছাড়তে হবে। রাজ্যজুড়ে আন্দোলন, রাজ্যজুড়ে বয়কট—বাংলাদেশ উত্তেজনায় কাঁপছে। সেই সময়ই সরকারের শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ডন সোসাইটির উদ্যোগে শুরু হল জাতীয় বিদ্যালয়—যার পরিণতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ওদিকে প্রতিবাদের পর প্রতিবাদে, আন্দোলন ও বয়কটের জন্যে সবশেষে সরকার বাধ্য হন বঙ্গবিভাগ বন্ধ করে দিতে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন দেশের শিক্ষানীতি কী হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ আগরতলা কুমিল্লা ও বরিশাল

ঘুরে এলেন, বক্তৃতাও দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এলেন শান্তিনিকেতনে। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাঠালেন। ছোট মেয়ে মীরার বিয়ে দিলেন নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। মেয়ের বিয়ের পরে জামাতার জেলা বরিশাল ঘুরে এলেন মেয়ে জামাইকে সঙ্গে নিয়ে। তারপর ছোট জামাইকেও আমেরিকায় পাঠিয়ে দিলেন কৃষিবিদ্যা শিখতে। তেমনি বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকেও আমেরিকায় পাঠান গোপালনতত্ত্ব শেখার জন্যে। আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর রথীন্দ্রনাথের বিয়ে দেন বালবিধবা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে। রথীন্দ্রনাথকে জমিদারির কাজে লাগান এবং মাঠে ট্র্যাকটর চালাতে লাগালেন জমিদারিতে প্রজাদের হিতার্থে।

রবীন্দ্রনাথের লেখালেখির কাজ অনবরত চলছে, কবিতা ও প্রবন্ধ তো আছেই, তাছাড়া এই সময় 'মাস্টারমশায়' নামে একটি বড়গল্প লেখেন প্রবাসী পত্রিকায়। কিছুদিন পর 'গোরা' উপন্যাস ধারাবাহিক রচনায় হাত দেন।

এদিকে দেশের রাজনৈতিক সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। কবি নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেন না। হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক অশান্তি ক্রমেই বাড়তে লাগল। রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে 'ব্যাধি ও প্রতিকার' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখলেন—'আজ হিন্দু মুসলমানকে সম্প্রীতির চোখে দেখিতে পারিতেছে না, মুসলমানও হিন্দুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে ভয় পাইতেছে—এই যে পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস ইহাই আজ আমাদের জীবনের প্রধানতম বিপদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন স্বদেশকে উদ্ধার করতে হবে কার হাত থেকে? উত্তর তিনি নিজেই বলেন 'নিজেদের পাপ হইতে।' দেশের মধ্যেও নানা রকমের অশান্তি ও কলহ। রবীন্দ্রনাথ এই আবর্ত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন।

এই সময়ই পল্লীসমাজ সংস্কারের কাজে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন। শিলাইদহ হল তাঁর প্রধান কর্মভূমি। তিনি বলছেন—'আমি সম্প্রতি পল্লীসমাজ নিয়ে পড়েছি। আমার জমিদারির মধ্যে পল্লীসংগঠন কার্যের দৃষ্টান্ত দেখাব বলে স্থির করেছি। কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি।' সত্যিই তাই, তিনি তাঁর প্রজাদের সঙ্গে নিয়ে রাস্তা বাঁধানো, পুকুর সারানো, জঙ্গল সাফ করানো ইত্যাদি নানা কাজে জড়িয়ে পড়লেন। তিনি একটা

চিঠিতে লিখছেন—'আমি গ্রামে গ্রামে যথার্থভাবে স্বরাজ স্থাপন করতে চাই। সমস্ত দেশে যা হওয়া উচিত, ঠিক তারই ছোট প্রতিকৃতি।'

কবি যখন পল্লীসমাজ নিয়ে ব্যস্ত, তখন খবরের কাগজে দেখলেন ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে সুরাটের কংগ্রেস দক্ষযজ্ঞে পরিণত হয়েছে। অধিবেশন পণ্ড। রবীন্দ্রনাথ সুরাটের সমাচারে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন। তিনি দু'পক্ষেরই সংবাদ নিয়ে 'প্রবাসী পত্রিকায় 'যজ্ঞভঙ্গ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিবাদ অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে তিনি মন্তব্য করলেন। তিনি জানালেন, সভা কিংবা মিছিল নয়, গণসংযোগই আসল কথা। দু'পক্ষই যখন উত্তেজিত তখন ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতি কে হবেন তাই নিয়ে কলহ আরও বেড়ে গেল। অনেক সাধাসাধির পর রবীন্দ্রনাথ সভাপতি পদ গ্রহণে রাজি হন। এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় তাঁর ভাষণ পাঠ করেন। এতদিন সব সভাপতির ভাষণই ইংরেজিতে পড়া বা বলা হয়েছিল। তবে এই সম্মেলনে কবির ভাষণ কারও তেমন পছন্দ হয়নি। কারণ অনেকগুলি স্পষ্ট কথা ছিল ভাষণে।

এই সময়েই চরমপন্থা গুরুতর আকার ধারণ করে। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নামে দুই যুবক মজঃফরপুরে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলক্রমে ব্যারিস্টার কেনেডির স্ত্রী ও তাঁর শিশুকন্যাকে বোমা মেরে হত্যা করে। এই সংবাদে দেশময় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পরই মাণিকতলার একটি পোড়ো বাগানে বোমার কারখানা অবিষ্কৃত হয়। এই সব ঘটনায় ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ 'পথ ও পাথেয়' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করে তা চৈতন্য লাইব্রেরিতে পাঠ করেন। তিনি এই আত্মঘাতী পথ সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত পথ নয় বলেও লিখলেন—'বস্তুত বাঙালি জাতি বহুদিন হইতে ভীরু অপবাদের দুঃসহ ভার বহন করিয়া নতশির হইয়াছে বলিয়াই বর্তমান ঘটনা সম্বন্ধে ন্যায় অন্যায় ইষ্ট অনিষ্ট বিচার অতিক্রম করিয়াও অপমান-মোচনের উপলক্ষে বাঙালি জাতির মনে একটা আনন্দ না জন্মিয়া থাকিতে পারে নাই।'

১৯০৮ সাল। শান্তিনিকেতনে শুরু হল ঋতুউৎসব। প্রথমে পর্জন্য মহোৎসব—যা পরে বর্ষামঙ্গলে রূপান্তরিত হয়—এবং শারদোৎসব।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় নিয়ে কবি তখন খুব ব্যস্ত। এমন সময় অতর্কিতে এক উপদ্রব। খুলনার ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত থেকে তাঁর নামে সাক্ষীর সমন এল। খুলনার সেনহাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক হীরালাল সেন 'হুংকার' নামে এক কবিতার বই রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেন। বইটি রাজরোষে পড়ে এবং রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িত থাকার দায়ে তাঁকে খুলনার আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়।

এর পরেই রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' নামে একটি নাটক লেখেন। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য বইটির নায়ক। কিন্তু কবি ধনঞ্জয় বৈরাগী নামক একটি চরিত্র সৃষ্টি করে নাটকটিকে অনন্যতা দান করেন। ধনঞ্জয় বৈরাগী গান্ধী চরিত্রের পূর্বাভাস। এই নাটকে কবি খাজনা না দেওয়ার আন্দোলন এবং অহিংসাকে গুরুত্ব দেন—যা পরবর্তীকালে গান্ধীজি আমাদের দেশে চালু করেন। ধনঞ্জয় বৈরাগী অহিংসা নীতির সমর্থক। রবীন্দ্রনাথ বহুদিন ধেকে বলে এসেছিলেন ভারতবর্ষের যিনি নায়ক হবেন, তিনি হবেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। সেই আদর্শায়িত নেতার মূর্তি ধনঞ্জয় বৈরাগী। পরে 'মুক্তধারা' নাটকে একই কথা অন্যভাবে ব্যক্ত করেছেন কবি। ধনঞ্জয় বৈরাগী এই নাটকেও আছে।

এদিকে 'গোরা' উপন্যাস লেখা শেষ হল, কবি গীতাঞ্জলির কবিতা লিখতে শুরু করলেন। এই সময় কবির ৫০ বছর পূর্তি উৎসব হয় শান্তিনিকেতনে। 'রাজা' নাটকটি সমসময়ে লিখিত। নয় বছর পর এই নাটকের অভিনয়যোগ্য আর একটি রূপ হয়, নাম দেওয়া হয় 'অরূপরতন'। তার পরের নাটক 'অচলায়তন' এবং 'জীবনস্মৃতি' নামক আত্মজীবনী। সেই সময় লেখার জোয়ার। কিছুদিন পরেই লেখা হল নতুন সাংকেতিক নাটক 'ডাকঘর'। এই সময়ই লেখেন 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি। ১৯১১ সালে কলকাতা কংগ্রেসে গাওয়া হয়। পরের বছর গাওয়া হয় ব্রহ্মোৎসবে।

এতসব কাজের মধ্যে নিজের জমিদারির লোকদের মঙ্গলকামনায় কবি নানা ভাবনা করে চলেছেন। তার সাক্ষ্য বহন করছে অনেক কাজ ও কিছু চিঠি। শিলাইদহ থেকে একটি চিঠিতে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে তিনি লিখেছেন—'বোলপুরে একটি ধানভানা কল চলছে। সেই রকম একটা কল এখানে আনতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে। এ দেশ ধানেরই দেশ।

বোলপুরের চেয়ে অনেক বেশি ধান এখানে জন্মায়। আমার ইচ্ছা ৫/১০ টাকা শেয়ার করে এখানকার অনেক চাষীরা মিলে এই কলটা যদি চালায়, তাহলেই ওদের মধ্যে মিলে কাজ করবার যথার্থ সূত্রপাত হতে পারবে।' রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতে প্রজাদের কুটির শিল্পে নিয়োগ করার কথাও ভাবেন। পটারি ও ছাতা তৈরি শেখানোর চেষ্টা তিনি করেন। তাছাড়া পতিসর কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করে চাষীদের সহজ সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থাও তিনি করেন।

চার

কবি বিলাত যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন। জাহাজে বসেই তিনি গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য ইত্যাদি থেকে কবিতা বাছাই করে তার ইংরেজি অনুবাদ করতে লাগলেন। গেলেন পোর্ট সৈয়দ। সেখান থেকে ফ্রান্সের মার্সাই বন্দর। তারপর প্যারিস। প্যারিসে একদিন থেকে পাড়ি দিলেন লণ্ডন। সঙ্গে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। একটি হোটেলে উঠলেন তাঁরা সবাই। বাইশ বছর পর কবি লণ্ডনে এলেন। শহরের পরিবর্তন—তার ব্যস্ততা, গাড়ি ঘোড়ার প্রবল হাঁকাহাকি কবিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করল।

রবীন্দ্রনাথ যখন ইংল্যাণ্ডে পৌঁছলেন তখন পূর্বপরিচিত অনেক বাঙালী ছাত্র সেখানে। সুকুমার রায়, কালীমোহন ঘোষ, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দমোহন বসু প্রমুখ। তাছাড়া ছিলেন স্যার পি. সি. রায়, ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রমথলাল সেন। ততদিনে রবীন্দ্রনাথ হোটেল ছেড়ে হ্যাম্পস্টেড হীথে একটি বাড়ি ভাড়া করে পুত্র-পুত্রবধূসহ উঠে গেলেন। তাঁর পূর্ব পরিচিত—কিছুদিন আগেই জোড়াসাঁকো বাড়িতে গগনেন্দ্র অবনীন্দ্রের অতিথি হয়ে ছিলেন—ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী রটেনস্টাইনের সঙ্গে আলাপ করতে যান এবং তাঁকে ইংরেজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি পড়ার জন্যে দেন। তিনি পাণ্ডুলিপি দেন কবি ইয়েটসকে পড়তে।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যিক ও মনীষীদের সঙ্গে

কবির পরিচয় হল। ১৯১২ সালের ১২ জুলাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক সম্বর্ধনা সভায় কবি ইয়েটস ছিলেন সভাপতি। তিনি তাঁর বক্তব্যের শেষাংশে বলেন, 'তাঁর লেখা প্রায় ১০০টি গীতিকবিতার গদ্যানুবাদের একটি খাতা আমি আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফিরছি। আমার সমসাময়িক আর কোন লোকের এমন কোন ইংরেজি রচনার বিষয় আমি জানিনে, যার সঙ্গে এই কবিতাগুলির তুলনা হতে পারে।'

রবীন্দ্রনাথ তখনকার ইংল্যাণ্ডের বিদ্বজ্জনদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। চার্লস এণ্ড্রুজ এবং উইলি পিয়ার্সন তো ছিলেনই, তাছাড়া ইয়েটস ও রটেনস্টাইন ছাড়া ছিলেন বার্ট্রাণ্ড রাসেল, এইচ. জি. ওয়েলস, লোয়েস ডিকিনসন, স্টপফোর্ড ব্রুক্স্, আরনেস্ট রীহ্স্, এভেলিন আনডারহিল, ফক্স স্ট্রাংগওয়েজ, এজরা পাউণ্ড প্রভৃতি প্রবীণ ও তরুণ মনীষীগণ। ট্রকেডোরা হোটেলে কবির এক সম্বর্ধনা সভা হল। ইণ্ডিয়া সোসাইটি ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। ইয়েটস ভূমিকা লিখে দিলেন।

ইংল্যাণ্ডে মাস চারেক থেকে পুত্র ও পুত্রবধূসহ কবি গেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নিউইয়র্ক থেকে সোজা ইলিনয়ের আর্বানা শহরে। সেখানেই রথীন্দ্রনাথ পড়াশোনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্থানীয় সুধিজনের ডাকে কয়েকটি বক্তৃতাও দিলেন। পরে আর্বানা থেকে গেলেন শিকাগো। সেখান থেকে রচেস্টার। সেইখানে রবীন্দ্রনাথ 'জাতিসংঘাত' নিয়ে একটি বক্তৃতা দিলেন। রচেস্টার থেরে বস্টন ও পরে হার্ভার্ড। অবশেষে নিউইয়র্ক শিকাগো ঘুরে আবার আর্বানায়। রবীন্দ্রনাথ মার্কিন দেশে ছয় মাস ছিলেন। সেখানে থাকতে থাকতেই খবর পেলেন ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয়েছে।

বিলেতে এসে কবি দেখেন কাগজে কাগজে গীতাঞ্জলির প্রশংসা বেরিয়েছে। ক্যাক্স্টন হলে অনেকগুলি বক্তৃতা দিতে হল তাঁকে। সেগুলি একত্র করে বেরোল 'সাধনা' নামে ইংরেজি বই। বিলেতে থাকতেই 'ডাকঘর' ও 'রাজা' নাটক দুটির অনুবাদ হয় এবং অভিনয়ও হয় সেই দেশে 'পোস্ট অফিস' ও 'দ্য কিং অভ্ দ্য ডার্ক চেম্বার' নামে।

শান্তিনিকেতনে ফিরে ১৯১৩ সালের ২৫ নভেম্বরে খবর পেলেন তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। দেশ জুড়ে হৈচৈ, শান্তিনিকেতনে উৎসব। সর্বপ্রথম একজন ভারতীয় এ পুরস্কার পেলেন। এশিয়া মহাদেশেও

তিনি প্রথম। কলকাতা থেকে গুণিজনরা শান্তিনিকেতনে এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলেন কবিকে। বাংলার কবি হলেন বিশ্বকবি। কিন্তু সেদিন আম্রকুঞ্জে কবির ভাষণ অনেকের ভালো লাগেনি। দু'দিন আগেও যাঁরা তাঁর সমালোচনায় মুখর ছিলেন, তাঁদের কয়েকজকে সামনে দেখে তিনি বলেন, 'এই সম্মানমদিরা আমি ওষ্ঠে স্পর্শ করলেম, কিন্তু অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারলেম না।'

ঠিক এই সময়ই দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি অত্যাচার বন্ধ করার জন্যে ডারবানে ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করছেন। সেখানকার অবস্থা সরেজমিন দেখার জন্যে এনড্রুজ ও পিয়ার্সন যাচ্ছেন। কবি এনড্রুজকে এক চিঠিতে লেখেন—'আপনি শ্রীযুক্ত গান্ধী ও অন্যান্যদের সঙ্গে আফ্রিকায় আমাদের হয়েই লড়ছেন।' গান্ধীজি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম উল্লেখ—যা বিশেষ সম্পর্কে পরিণত হয় অচিরেই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মানিত করতে এগিয়ে এলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। তাঁকে ডি-লিট উপাধি দেওয়া হল। এদিকে প্রমথ চৌধুরী ১৯১৪ সালে 'সবুজপত্র' নামে চলতি বাংলায় লেখা একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগ দিলেন এবং তার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের সব গদ্যরচনা চলতি বাংলাতেই প্রকাশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রসাহিত্যেও নতুন যুগের সূচনা হল 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ থেকে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসও এই সময়ের ফসল।

১৯১৪ সালে লাগল বিশ্বযুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত হলেন এই খবরে। শান্তিনিকেতনের মন্দিরে সাপ্তাহিক প্রার্থনা সভায় তিনি বললেন— 'বিশ্বের পাপের যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে সেই বিশ্বপাপকে দূর কর।'

ওদিকে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে কবির মন বসছে না। বিদ্যালয় পরিচালনা নিয়ে অধ্যাপকদের মনোভাবে কবির মন বিষণ্ণ।

কবি এনড্রুজ মারফৎ খবর পেলেন গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকার পাট শেষ করে ভারতে ফিরে আসতে চান। এনড্রুজের মধ্যস্থতায় গান্ধীজির ফিনিক্স স্কুলের ছাত্ররা শান্তিনিকেতনে এসে যোগ দিলেন। ১৯১৫ সালে। দলে গান্ধীজির ছেলে দেবদাস ও ভাইপো মগনলালও আছেন। কয়েকদিন পর গান্ধীজি ও কস্তুরবা এসে যোগ দিলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরই গান্ধীজিকে পুনে চলে যেতে হল। খবর এসেছে গোপালকৃষ্ণ গোখলে মারা গিয়েছেন।

সেবার কবির সঙ্গে গান্ধীজির দেখা হয়নি। সেই সময় আচার্য কৃপলানি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তিনি তখন ইতিহাসের অধ্যাপক ও মজঃফরপুর কলেজের অধ্যক্ষ। কথা প্রসঙ্গে তিনি গান্ধীজিকে বলেন, 'ইতিহাস বলে, অহিংসার পথে কোন দেশ স্বাধীন হয়নি।' উত্তরে গান্ধীজি বলেন, 'ইতিহাসের শেষ অধ্যায় কি লেখা হয়ে গিয়েছে?'

এদিকে গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হল, কথাও হল। ছাত্ররা নিজের কাজ নিজে করে না দেখে গান্ধীজি ক্ষুণ্ণ হলেন। বললেন সব কাজ নিজেদের করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ এই কাজের পরিণতি জেনেও সম্মতি দিলেন। গান্ধীজি ও তাঁর ফিনিক্স স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে

আশ্রমের ছাত্ররা তরকারি কাটা, বাসন মাজা, রান্না করা, ঘর-দুয়ার সাফ করা, পায়খানা পরিষ্কার করা—সব কাজ নিজেরা করতে লাগল। গান্ধীজি ও তাঁর স্কুলের ছাত্ররা এর কিছুদিন পরেই গেলেন কুম্ভমেলা দেখতে। সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেলেন তাঁরা। কিন্তু এই অল্প কয়েকদিনে শান্তিনিকেতনে ঝড় বইয়ে দিয়ে গেলেন। ১৯১৩ সালের ১০ মার্চ এই পরীক্ষা শুরু হয়েছিল বলে আজও প্রতি বছর এই তারিখটিতে 'গান্ধীপুণ্যাহ' অনুষ্ঠিত হয় শান্তিনিকেতনে। ওই একটি দিন আজও সব কাজ করতে হয় ছাত্রছাত্রীদের।

দিন দশ বারো পর বাংলার ছোটলাট লর্ড কারমাইকেল আসেন শান্তিনিকেতনে। কিছুদিন আগেই শান্তিনিকেতনে ছাত্র ভর্তি না করানোর জন্যে সরকারি সার্কুলার গিয়েছিল সব সরকারি কর্মীদের বাড়িতে। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর এই সার্কুলার প্রত্যাহার করে স্বয়ং ছোটলাট বাহাদুর শান্তিনিকেতন আসেন। আম্রকুঞ্জে নতুন বানানো যে বেদির ওপর কারমাইকেলকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় আজও তা 'কারমাইকেল বেদি' নামে পরিচিত।

সেই সময়ই লিখলেন 'চতুরঙ্গ' নামে উপন্যাস। সেই সময়েই সাহিত্যে বাস্তবতার প্রসঙ্গ তুলে রবীন্দ্রসাহিত্যকে আক্রমণ করেন বিপিনচন্দ্র পাল। তার প্রতিবাদ করেন অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ছোটগল্প 'স্ত্রীর পত্র' তথাকথিত বস্তুতন্ত্রবাদীদের পছন্দ হয়নি। বিপিনচন্দ্র পাল লিখলেন 'মৃণালের পত্র' নামে পাল্টা একটি গল্প। বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে হাত মেলালেন গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধ্রী। তাঁদের লেখা ছাপাতে লাগল চিত্তরঞ্জন দাসের 'নারায়ণ' পত্রিকা।

এই সময়ের বড় ঘটনা ১৯১৫ সালের ৩ জুন রবীন্দ্রনাথের 'স্যার' উপাধি লাভ। কবি সেই সময়ই গেলেন কাশ্মীর বেড়াতে। শিকারাতে থাকলেন। বিখ্যাত কবিতা 'বলাকা'—সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা—সেই সময়ই লেখা। এই সময় শেক্সপিয়রের তিনশত বর্ষপূর্তি উপলক্ষে লিখলেন একটি কবিতা। কাশ্মীর থেকে ফিরেই গেলেন শিলাইদহে। কলকাতায় ফিরে একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ পড়লেন—'শিক্ষার বাহন'। তিনি বললেন, 'মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ।'

বহুদিন থেকেই কবির জাপান যাওয়ার ইচ্ছে। ১৯১৬ সালে একটি জাপানি জাহাজে রওনা হলেন। সঙ্গে এনড্রুজ, পিয়ার্সন ও মুকুল দে। রেঙ্গুন পেনাঙ সিঙ্গাপুর হংকং হয়ে জাপানের কোবে বন্দরে নামলেন। সেখান থেকে ওসাকা। বক্তৃতাও দিলেন সেখানে, টোকিওতে উঠলেন পূর্বপরিচিত জাপানি চিত্রশিল্পী টাইকানের বাড়িতে। টাইকান কিছুদিন জোড়াসাঁকোয় এসে ছিলেন। তারপর বক্তৃতা ও সম্বর্ধনার পালা। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার পরই উয়োনো পার্কে সম্বর্ধনা। কবি জাপানের মারমুখো নীতির নিন্দা করলেন এক বক্তৃতায়। তা জাপানিদের পছন্দ হয়নি। জাপানে বাসকালে টোমো ওয়াদা কোরা নামে এক জাপানি তরুণীর সঙ্গে আলাপ হয়। সেই আলাপ গভীর হয় পরে। ওয়াদা পরে শান্তিনিকেতনেও এসেছিলেন। কবির অনুরাগী ভক্ত হিসাবে তিনি ছিলেন নমস্যা।

জাপানে তিন মাস থেকে পাড়ি দিলেন মার্কিন মুলুকে। সিয়াটেলে নামলেন। তারপর পোর্টল্যাণ্ড সানফ্রানসিসকো লস এঞ্জেলেস সান ডিয়েগো প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। এই বক্তৃতামালাই 'পার্সোনালিটি' ও 'ন্যাশনালিজম' নামে পরে ছাপা হয়। তারপর এলেন পূর্বতীরে নিউইয়র্ক। সেখান থেকে বস্টন ইয়েল ও আরও কয়েকটি জায়গা ঘোরার পর স্থির করলেন দেশে ফিরে যাবেন। ফেরার পথে ক্লীভল্যাণ্ড শহরে নাগরিকদের অনুরোধে শেক্সপিয়ার গার্ডেনসে বৃক্ষরোপণ করলেন। সেটাই তাঁর হাতে প্রথম বৃক্ষরোপণ। পরে শান্তিনিকেতনে এটি হয় অন্যতম প্রধান উৎসব। সানফ্রানসিসকো হয়ে গেলেন হনলুলু। সেখান থেকে জাপান। দেশে ফিরলেন ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে।

কলকাতায় এসে দেখলেন ঠাকুরবাড়িতে 'বিচিত্রা ক্লাব' জমে উঠেছে। কিন্তু পারিবারিক নানা সমস্যা কবিকে বিষণ্ণ করে রাখল। জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলা মৃত্যুশয্যায়। জামাই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কবির বনিবনা নেই। ওদিকে দেশের রাজনীতিও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। সন্ত্রাসবাদীদের বোমার শব্দ শোনা যায় চারিদিকে। বৃটিশ সরকারের হাতে বহু ছেলে জেলবন্দি। স্বরাজলাভের আন্দোলনও শুরু হয়েছে। এইসব ঘটনায় উত্তেজিত কবি সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিতে লাগলেন। 'কর্তার

ইচ্ছায় কর্ম' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়লেন রামমোহন লাইব্রেরি হলে। 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটি গাওয়া হল সভায়।

এদিকে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থাও খারাপের দিকে। অ্যানি বেশান্ত জেলে। মুক্তির জন্যে আন্দোলন চলল। তাঁর মুক্তি হল। এই রাজনৈতিক ডামাডোলের মাঝখানে জোড়াসাঁকো বাড়িতে 'ডাকঘর' নাটক অভিনীত হল। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন গান্ধীজি, বালগঙ্গাধর টিলক, মদনমোহন মালবীয়, অ্যানি বেশান্ত প্রমুখ। ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিতে স্যাডলার-কমিশন বসল। শিক্ষা সম্পর্কে কবির মত ইংল্যাণ্ডের লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার মাইকেল স্যাডলার জানতে চাইলে তাঁর মতামত তিনি লিখে পাঠালেন। বললেন—'ইংরেজি ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষারূপে খুব ভালো করে শেখাতে হবে। কিন্তু স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত মাতৃভাষার আধারে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখানো দরকার।'

১৯১৭ সালের শেষদিকে তখনকার ভারতসচিব স্যামুয়েল মণ্টেগু ভারতে এলেন স্বরাজ দেওয়ার ব্যাপারে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি দেখা করে গেলেন জোড়াসাঁকো বাড়িতে। এই সময় বাংলার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কবি প্রথম দিনে 'ইণ্ডিয়া'জ প্রেয়ার' নামে একটি কবিতা অধিবেশনে পাঠ করেন, 'হোয়ার দ্য মাইণ্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার'—ইত্যাদি। এটি কবির 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ। তার আগে ১৮৮৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে নিজের লেখা গান 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি গেয়ে তিনি শোনান। ১৮৯০ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম কবিতায় নিজে সুর দিয়ে গেয়ে শুনিয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের কাজে তারপর মনপ্রাণ সমর্পণ করলেন। এবার শান্তিনিকেতনে বহু গুজরাতী ছাত্র এসেছে। মরাঠী, রাজস্থানী, মালয়ালি ছাত্র আগেই এসেছে। নূতন ছাত্রদের দেখে ও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে রবীন্দ্রনাথের মনে নতুন চিন্তা মাথায় এলো। গুজরাতীদের কাছ থেকে বেশ কয়েক হাজার টাকা পাওয়া গেল। ৭ই পৌষের উৎসবের পরদিন বিশ্বভারতীর শিলান্যাস করা হল। বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কলকাতা থেকে আনলেন সহায়তা করার জন্যে।

মহীশূর সরকারের ডাকে কবি গেলেন বাঙ্গালোর ও মহীশূর। দু'জায়গাতেই বক্তৃতা দিলেন। গেলেন বিশ্রাম নিতে উতকামণ্ডের শৈলাবাসে। তারপর সালেম পালিঘাট শ্রীরঙ্গপত্তনম তাঞ্জোর তিরুচিরপল্লী, কুম্ভকোনম মাদুরাই প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিয়ে এলেন। থিওসফিস্টদের কেন্দ্র মদনপল্লী গেলেন। তারপর আডিয়ার। অ্যানি বেশান্তের স্কুলে আচার্যরূপে ভাষণ দিলেন—'দ্য সেণ্টার অব্ ইণ্ডিয়ান কালচার।'

এমন সময় এল পঞ্জাব থেকে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক স্থানে নিরীহ লোকদের হত্যাকাণ্ডের খবর। কড়া সামরিক আইনে এই নিদারুণ ঘটনার খবর পর্যন্ত ছাপতে দেওয়া হল না। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেলেন। তিনি এক চিঠিতে সে সময় লেখেন—'এই দুঃখের তাপে আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিল।' স্থির করলেন এর প্রতিবাদ করতে হবে। চিত্তরঞ্জন দাসকে বললেন, প্রতিবাদ সভা ডাকুন, তাতে সভাপতিত্ব করব আমি। চিত্তরঞ্জন রাজী হলেন না। গান্ধীজিকে লিখে পাঠালেন—'দু'জনে মিলে আইন ভেঙে পঞ্জাবে ঢুকব'। গান্ধীজিও রাজি হলেন না।

পরে মনের দুঃখে অসহ্য যন্ত্রণায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে ১৯১৯ সালের ১৯ মে চিঠি লিখে বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডকে জানালেন তিনি আর স্যার থাকতে চান না। পদবীটি তিনি ফিরিয়ে দিলেন। অসাধারণ সেই চিঠি। কবির মনের সব বেদনা সব ক্ষোভ তাতে প্রকাশিত। তিনি এক চিঠিতে সে সময় লেখেন—'বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমে উঠেছিল। তারই ভার আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে, তাই ঐ ভারের উপরে আমার ঐ উপাধির ভার আর বহন করতে পারছিনে।'

কবি সপরিবারে গেলেন শিলং পাহাড়ে। সেখান থেকে গৌহাটি হয়ে ট্রেনে সিলেট। সিলেটে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এইখানেই প্রথম মনিপুরি নাচ দেখেন ও মুগ্ধ হন। আগরতলা হয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে মনিপুরি নাচের মাস্টার নিয়ে যান। শান্তিনিকেতনে সেই থেকে মনিপুরি নাচ শুরু এবং বাংলাদেশে নতুন হাওয়া তিনি নিয়ে এলেন সংস্কৃতি জগতে। এই নাচকে অবলম্বন করেই তৈরি হল নতুন নাটক, নতুন পালাগান। ১৯২৬ সালে 'নটীর পূজা' নাটকে শ্রীমতীর নাচ ভারতের নৃত্য জগতে

নতুন দিগন্তের সন্ধান দিল।

আহমেদাবাদে গুজরাতি সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্যে আহ্বান এল গান্ধীজির কাছ থেকে। অতিথি হলেন অম্বালাল সরাভাইয়ের। সভাপতিত্বের পালা চুকলে পর আহমেদাবাদের কাছেই গান্ধীজির সবরমতী আশ্রম দেখতে কবি গেলেন। তারপর চলল কাঠিয়াবাড় অঞ্চল সফর। সেখান থেকে এলেন বোম্বাই শহরে। তখন অন্যতম প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ্। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের স্মরণে একটি সভা হচ্ছিল সেই সময়। জিন্নাহ্ অনুরোধ করেন রবীন্দ্রনাথকে একটি ভাষণ লিখে পাঠাতে। রবীন্দ্রনাথ জিন্নাহ্‌র এই অনুরোধ রক্ষা করেন।

বোম্বাই থেকে বরোদা। মহারাজা গায়কোওয়াড়ের অতিথি। কবিকে সম্বর্ধনা জানানো হল। বরোদা থেকে সুরাট এবং আবার বোম্বাই হয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। কবি সব জায়গাতেই তাঁর প্রস্তাবিত বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার কারণ বিশ্লেষণ করলেন। গুজরাট থেকে ফিরেই কবি আবার বিলাত যাওয়া স্থির করলেন। ততদিন প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ। ইউরোপে আবার ভাঙাগড়ার কাজ শুরু হয়েছে। কবি ভাবছেন এবার ওখানে গিয়ে ইউরোপের পুনর্গঠন নিয়ে যাঁরা চিন্তা করছেন তাঁদের সেই চিন্তার আভাস পাওয়া যাবে।

পাঁচ

১৯২০ সালের ৫ জুন ইংল্যাণ্ডের বন্দরের ঘাটে কবির জাহাজ ভিড়ল। জাহাজঘাটায় এসেছেন কবির সুহৃদ পিয়ার্সন। লণ্ডনে পৌঁছনোর পর রটেনস্টাইন প্রমুখ বন্ধুরা দেখা করতে এলেন। ভোজসভা পার্টি ইত্যাদিও চলল, কিন্তু কবি অনুভব করলেন একটু দূরত্বের ভাব। কবির 'স্যার' উপাধি ত্যাগ রাজভক্ত ইংরেজরা ভাল চোখে দেখে নি।

ইংল্যাণ্ড থেকে কবি গেলেন ফ্রান্সে। সেখানে কাহ্ন নামে এক বিশাল ধনী কবির আতিথ্যভার গ্রহণ করেন। সেই বাড়িতে কবির সঙ্গে দেখা করতে আসেন সিলভাঁ লেভি আঁরি বেগম, লে ব্রণ, কঁতেস দ্য নোআই প্রভৃতি অনেক গুণীজ্ঞানী। তারপর নেদারল্যাণ্ড থেকে নেমন্তন্ন

পেয়ে কবি সেখানে দিন পনেরো ছিলেন। দ্য হেগ, আমস্টারডাম রটারডাম প্রভৃতি জায়গায় তিনি বক্তৃতা দেন। তারপর বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে বক্তৃতা দিয়ে ফিরে এলেন প্যারিসে।

ইউরোপ থেকে কবি গেলেন আমেরিকা। কিন্তু তাঁকে নিয়ে কোন উচ্ছ্বাস নেই, আগ্রহ নেই। ব্রুকলিন নিউইয়র্ক ও হার্ভার্ডে বক্তৃতা হল বটে, কিন্তু কোন আন্তরিকতা নেই উদ্যোক্তা বা শ্রোতাদের মনে। সম্ভবত 'স্যার' উপাধি ত্যাগ এই অনাগ্রহের অন্যতম কারণ। তবে সেখানকার 'পোয়েট্রি সোসাইটি' কবি-সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেন। শ্রীমতী মুডি ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা।

আমেরিকায় আলাপ হয় লেনার্ড এল্‌মহার্স্ট নামে এক তরুণ ইংরেজের সঙ্গে। এই আলাপ পরে অন্তরঙ্গতার রূপ নেয়। এই তরুণ রবীন্দ্রনাথের গ্রাম সংস্কার বিষয়ে আগ্রহ দেখালেন এবং তাঁর স্ত্রীর সাহায্যে যাবতীয় টাকাকড়ি দিতে প্রতিশ্রুতি দেন। সেই প্রতিশ্রুতি তিনি আজীবন রক্ষা করেন। শ্রীনিকেতনের যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি ও তাঁর স্ত্রী বহন করে যান আমৃত্যু।

আমেরিকা থেকে ইংল্যাণ্ড। সেখান থেকে প্লেনে চড়ে প্যারিস। সেই তাঁর প্রথম বিমান চড়ার অভিজ্ঞতা। প্যারিসে থাকতেই তাঁর সঙ্গে আলাপ, পরে হৃদ্যতা হয় রমাঁ রল্যাঁর সঙ্গে। আর হয় অসামান্য কর্মী ও ভাবুক পেট্রিক গেডিসের সঙ্গে।

এদিকে দেশে অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে দারুণ উত্তেজনা। কবি ফিরে এলেন। তিনি দেখতে পেলেন শান্তিনিকেতনও অসহযোগ আন্দোলনের বড় কেন্দ্র হয় উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে নেই, তখন গান্ধীজি এসে তাঁর 'বড়দাদা' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন থাকেন। গান্ধীজির সঙ্গে পরামর্শ করতে আসেন বিখ্যাত আলি-ভাইদের সৌকত আলি। আর সেসময় আসেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। তবে রবীন্দ্রনাথ বরাবরের মত তখনও বারবার বলে চলেছেন যে, শান্তিনিকেতনকে যেন রাজনীতির আবর্তে ঠেলে না দেওয়া হয়। অথচ রবীন্দ্রনাথ যখন বিদেশে, তখন শান্তিনিকেতনের বেশ কিছু লোক অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। এই আন্দোলনের সবচেয়ে উৎসাহী সমর্থক ছিলেন কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ স্কুল ও কলেজ বয়কট সমর্থন করলেন না। দেশে ফিরে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে এক প্রবন্ধ পাঠ করলেন। বিষয় 'শিক্ষার মিলন।' তাঁর মত ইউরোপ যে আজ জয়ী, তা হয়েছে বিদ্যার জোরে। সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, অপরাধই বাড়বে।

শুধু এখানেই তিনি থামলেন না, কিছুদিন পর আর একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন। নাম 'সত্যের আহ্বান'। প্রবন্ধে গান্ধীজির মহত্ত্ব স্বীকার করেও কবি তাঁর মত ও পথ মেনে নিতে পারেন নি। বাংলার লোক কবির সেদিনের কথা পছন্দ করেনি। গান্ধীজি কয়েকদিন পরে কলকাতায় এলে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দু'জনে প্রায় চার ঘণ্টা আলাপ হয় নিভৃতে। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন সি. এফ. এনড্রুজ। কী কথা হয়েছিল সেদিন, তা আজ পর্যন্ত কেউ জানেনা।

রাজনৈতিক টানাপোড়েনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কবি মন দিলেন কাব্যরচনায়। লিখলেন 'শিশু ভোলানাথ'। সেই সময় আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পৌরোহিত্যে বিশ্বভারতীর পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা হল, সংবিধানও তৈরি হল। অতিথি অধ্যাপক হিসাবে ফ্রান্স থেকে এলেন সিলভাঁ লেভি। বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের কাজ শুরু হল তাঁকে দিয়ে। ওদিকে সারা দেশে উত্তেজনার অন্ত নেই। গান্ধীজি করবন্ধ আন্দোলন শুরু করলেন গুজরাতের বরদৌলি এলাকায়। আন্দোলন সফল হয়নি। রবীন্দ্রনাথ গুজরাতেরই নামকরা এক সাহিত্যিককে এক চিঠিতে লেখেন, অহিংসা মন্ত্রকে এভাবে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার মধ্যে বিপদ অনেক। লোকের মনকে প্রস্তুত না করে এরূপ আন্দোলনের প্রবর্তন আর রণশিক্ষা না দিয়ে যুদ্ধে সৈন্য নামানো একই।

বিশ্বভারতীর বিপুল ব্যয়ভার নিয়ে কবি চিন্তিত। বক্তৃতা সফরে গেলেন বোম্বাই, পুনে, মহীশূর। সেখান থেকে মাদ্রাজ, মঙ্গলুর হয়ে শ্রীলঙ্কা। সেখান থেকে ভিক্ষাপাত্র হাতে আবার মাদ্রাজ ও তিরুবনন্তপুরম। তারপর বোম্বাই। পার্সি সমাজের কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানালেন। সাহায্য কিছু মিলল। বোম্বাই থেকে আহমেদাবাদ গিয়ে অম্বালাল সরাভাইয়ের অতিথি হয়ে ছিলেন কিছুদিন। গান্ধীজি তখন কারাগারে, তাই দেখা হয়নি দু'জনে। তবু কবি গিয়েছিলেন সবরমতী আশ্রমে।

কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলেন দক্ষিণ ও উত্তর ভারত থেকে। বিশ্বভারতীতে তখন নামী দামী বিদেশি অধ্যাপক। সবাই শান্তিনিকেতন আলো করে বসেছেন। ভি. টারনিৎস বেনোয়া, লেজনি, বগদানোভ, স্টেলা ক্রামরিশ প্রভৃতি গুণীজ্ঞানীদের ভিড়। ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনের কাজের সঙ্গে দেশের কাজ ও লেখালেখি চলছে অবিরত।

কিন্তু বিশ্বভারতীর এই নতুন কর্মযজ্ঞে চাই বিপুল পরিমাণ টাকা। টাকা কোথায়? কবি বেরোলেন আবার। টাকার খোঁজে প্রথমে গেলেন কাশী। সেখানে ভাষণ দিলেন। তারপর লখনউ। কবি ও গীতিকার অতুলপ্রসাদ সেনের বাড়িতে উঠলেন। তারপর বোম্বাই ও আহমেদাবাদ। সেখান থেকে করাচি। সিন্ধি বণিকদের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা পেলেন বিশ্বভারতীর জন্যে। এ যাত্রার শেষ গন্তব্যস্থল ছিল গুজরাতের পোরবন্দর।

কবি শান্তিনিকেতনে ফিরেই গেলেন শিলং। সেখানে লিখলেন 'যক্ষপুরী' নামে নাটক। সেটাই নাম পালটে হল 'রক্তকরবী'। কলকাতায় ফিরে 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হল। কবি নামলেন 'জয়সিংহ' চরিত্রে। আগে নেমেছিলেন 'রঘুপতি' চরিত্রে। শান্তিনিকেতনে তখন পুরোদমে ক্লাস চলছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও কিছু ক্লাস নিলেন। এমন সময় এল পিয়ার্সন সাহেবের ইতালিতে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যুসংবাদ। কবি বিষণ্ণ, তদুপরি কবির স্নেহভাজন সুকুমার রায়ের অকালে মৃত্যুও বিষাদে ভারাক্রান্ত করে তোলে তাঁকে।

দেশে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হয়েই চলেছে। রবীন্দ্রনাথ সে সময় লিখলেন দুটি প্রবন্ধ—'সমস্যা' এবং 'সমাধান'। তিনি স্পষ্ট করেই বললেন, ভারতবর্ষের কল্যাণে হিন্দু ও মুসলমানকে সমকক্ষ হতে হবে, আরও বললেন—'মুসলমানদের পক্ষে জোট বাঁধা যত সহজ, হিন্দুর পক্ষে তা' সম্ভব নয়। হিন্দু বিপুল অথচ দুর্বল। এ ক্ষেত্রে শুধু চরকায় সুতো কাটলে সমস্যার সমাধান হবে না। বিদেশিকে বিদায় করলেও আগুন জ্বলবে। এমনকি স্বদেশি রাজা হলেও দুঃখ দহনের নিবৃত্তি হবেনা। আজ দু'শো বছর আগে চরকা চলছিল। তাঁতও বন্ধ হয়নি। সেই সঙ্গে আগুনও দাউ দাউ করে জ্বলেছিল। সেই আগুনের জ্বালানিকাঠ হচ্ছে ধর্মে ধর্মে অবুদ্ধির জড়তা।'

১৯২৩ সালের শেষদিকে আবার গেলেন গুজরাত। টাকার সন্ধানে। প্রচুর টাকা পেলেন। তৈরি হল নতুন কলাভবন বাড়ি 'নন্দন'। ওদিকে চীন থেকে এসেছিল নিমন্ত্রণ। চীন যাবার পথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি বক্তৃতা দিলেন। চীনে কবির সফরসঙ্গী হলেন নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন, কালিদাস নাগ ও এল্‌মহার্স্ট। ১৯২৪ সালের ২১ মার্চ কলকাতা বন্দর থেকে জাহাজে রওনা হয়ে রেঙ্গুন পেনাং কুয়ালালামপুর হয়ে সিঙ্গাপুর। সেখান থেকে চীনগামী নতুন জাহাজে সাংহাই বন্দরে পৌঁছলেন ১২ এপ্রিল। সাংহাই থেকে নানকিং নদীপথে। তারপর পেইচিং। সব জায়গাতেই বক্তৃতা, সব জায়গাতেই ভিড়। প্রাচীনরা কবিকে সর্বত্র বিপুল সম্বর্ধনা দিলেও একদল নবীন কিন্তু কবিকে অভ্যর্থনা না জানিয়ে বিক্ষোভই দেখিয়েছিল।

চীন থেকে জাপান। সেখানেও বক্তৃতার পর বক্তৃতা। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সাক্ষাত হয় সেবার। টোকিওতে একটি বক্তৃতায় পূর্বে কবি জাপানিদের উগ্র জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে নিন্দা করেন। এই চীন ও জাপান সফরে কবির মনে যেমন নতুন অনেক কথা জেগে ওঠে, তেমনি ওকাকুরার সেই বিখ্যাত উক্তি 'এশিয়া ইজ ওয়ান' নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়। সাংহাইয়ে গঠিত হয় এশিয়াটিক এসোসিয়েশন।

১৯২৪ সালে দক্ষিণ আমেরিকা সফরে গিয়ে কবি গুরুতর অসুস্থ হন এবং কবি অনুরাগিণী ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পোর আন্তরিক সেবায় সুস্থ হয়ে ওঠেন।

১৯২৪ সালের ২১ জুলাই কলকাতায় ফিরেই নিমন্ত্রণ পেলেন দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উৎসব যোগ দেওয়ার। কবি আবার বিদেশে পাড়ি দিলেন। তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল যাবার পথে ইজরায়েল ঘুরে দেখার। কিন্তু সময়াভাবে তা আর হল না। ফ্রান্স থেকে দক্ষিণ আমরিকার আর্জেণ্টিনাগামী জাহাজ ধরলেন। এলমহার্স্ট চললেন কবির সেক্রেটারি হয়ে। রাজধানী ব্যুয়েনেস এয়ারেসে যখন পৌঁছলেন কবি তখন অসুস্থ। ডাক্তাররা বললেন, পেরু যাওয়া চলবে না। তাই থাকতে হল আর্জেণ্টিনায়।

দৈবক্রমে সাক্ষাৎ হল কবিঅনুরাগিনী, ধনী ও বিদূষী ভিক্টোরিয়া

ওকাম্পো নামে এক মহিলার সঙ্গে। কবি তার আতিথ্য গ্রহণ করে সাম ইসিদ্রো নামক জায়গায় এক পুরানো বাগানবাড়িতে থাকতে লাগলেন। সেইখানে ওকাম্পোর সঙ্গে কবির সখ্য তৈরি হয়। ওকাম্পো কবির প্রতি ভালোবাসায় সব উজাড় করে দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একটি বাংলা শব্দ শেখান— ভালোবাসা। ওকাম্পো কবিকে নিয়ে যান চাপাদ সালাল নামক একটি জায়গায়। তাঁরই সেবা ও যত্নে কবির প্রবাসের দিনগুলি মাধুর্যে ভরে ওঠে। এই ওকাম্পোর সঙ্গে কবির ভালোবাসা ছিল আমৃত্যু। তিনি সান ইসিদ্রোয় যে সোফায় বসতেন সেইটি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে এখনো আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পূজারী' বইখানি উৎসর্গ করেন ওকাম্পোকে। কবিতা লেখেন—

> বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
> যে-প্রেয়সী পেতেছে আসন
> চিরদিন রাত্তিরে বাধায়
> কানে কানে তাহারি ভাষণ।

এদিকে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সঙ্গীন। বেঙ্গল অর্ডিনান্স পাশ করে অনেক নেতা ও কর্মী হলেন গ্রেপ্তার। বেলগাঁওয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে মহাত্মাজি সভাপতি। সভায় অসহযোগ নীতি স্থগিত রাখা হল। তবে চরকাকাটা ও খদ্দর প্রচার অব্যাহত রইল। শান্তিনিকেতনে এলেন গান্ধীজি। চরকানীতি নিয়ে দু'জনে নিভৃতে অনেক আলাপ হল। কেউ কাউকে নিজের মতে আনতে পারলেন না।

এই সময়ই অর্থাৎ ১৯২৫ সালের ১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস অকস্মাৎ পরলোকগমন করেন দার্জিলিঙে। রবীন্দ্রনাথ শেষ শ্রদ্ধা জানালেন একটি কবিতা দিয়ে—'এনেছিলে সাথে করি মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।' এই সময় সারা দেশে 'চরকা' নিয়ে মাতামাতি শুরু হয়েছে। কবি তার বিরুদ্ধে। তিনি এক প্রবন্ধে বললেন—'চরকার সঙ্গে স্বরাজকে জড়িত করে স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

চরকা সম্বন্ধে কবির মতামতকে অনেকেই সমর্থন করল না। কবি কিন্তু নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না। তিনি

'স্বরাজসাধন' নামক প্রবন্ধে লিখলেন—'খুব সহজে এবং খুব শীঘ্র স্বরাজ পাওয়া যেতে পারে, এই কথা কিছুদিন থেকেই দেশের মনকে মাতিয়ে রেখেছে। বহুকাল থেকে আমাদের ধারণা ছিল স্বরাজ পাওয়া দুর্লভ। এমন সময় যে-ই আমাদের কানে পৌঁছল যে, স্বরাজ পাওয়া খুব সহজ এবং অতি অল্প দিনেই পাওয়া অসাধ্য নয়, তখন এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে, বিচার করতে লোকের রুচি রইল না। তামার পয়সাকে সন্ন্যাসী সোনার মোহর করে দিতে পারে, এ কথায় যারা মেতে ওঠে—বুদ্ধি নেই বলেই যে মানে, তা নয়, লোভে পড়ে বুদ্ধি খাটাতে ইচ্ছে করে না বলেই তাদের এত উত্তেজনা।'

ইতালি থেকে দুই ভারততত্ত্ববিদ তুচ্চি ও ফর্মিকি ১৯২৫ সালে শান্তিনিকেতনে এলেন পড়াতে। সঙ্গে নিয়ে এলেন মুসোলিনীর দান—অনেক বই। সেই সময়ই ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের অধিবেশন বসে কলকাতায়। রবীন্দ্রনাথ হন তার সভাপতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে উপেক্ষিত ব্রাত্য জনতার ধর্মাদর্শের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন।

কবি আমন্ত্রিত হয়ে গেলেন লখনউ। সেখানে নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলন। সেখানে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে শান্তিনিকেতন ফিরে আসেন। ফেরার পরই ঢাকা থেকে এল নিমন্ত্রণ। গেলেন ঢাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি ভাষণ দিলেন 'দ্য ফিলজফি অব্ আর্ট' নিয়ে। ঢাকায় সাত দিন রাজকীয় সম্মান পেয়ে গেলেন ময়মনসিংহে ও কুমিল্লায়। সেখান থেকে আগরতলা। সেখানে যথাপূর্ব পেলেন বিপুল সম্বর্ধনা।

কলকাতায় ফিরে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে কবি বিমর্ষ। তখন বাধল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। এই সব দেখে শুনে বিরক্ত কবি এক চিঠিতে লিখছেন—'এই মোহমুগ্ধ ধর্মবিভীষিকার চেয়ে সোজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভাল।'' 'ধর্মমোহ' নামক কবিতায় লিখলেন—

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে,
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর
ধার্মিকতায় করে না আড়ম্বর।

শান্তিনিকেতনে ছোট্ট একটি নাটক লিখলেন—'নটীর পূজা'। অভিনয় হল শান্তিনিকেতনে ও কলকাতায়। এই প্রথম একজন ভদ্রঘরের মেয়েকে

মঞ্চে নৃত্য করতে দেখা গেল। সে যুগে এটি একটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। 'নটীর পূজা' ছাড়া অনেকগুলি গান কবি রচনা করেন। সেইগুলি 'বৈকালী' নামক হস্তাক্ষরে মুদ্রিত বইয়ে দেওয়া হয়। এই সময় প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' বইটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই বইয়ের প্রসঙ্গে লেখেন—'আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারের জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব।'

ছয়

১৯২৬ সালের ১২ মে মুসোলিনীর আমন্ত্রণে কবি চললেন ইতালি। সঙ্গী ছিলেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও তাঁর স্ত্রী রানী। এই সফর নিয়ে দেশে বিদেশে প্রচণ্ড হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। ফাসিস্ত মুসোলিনীর দেশে কবির নিমন্ত্রণ নিশ্চয়ই কোন কুমতলবে—সেটাই প্রচার হল চারদিকে। বন্ধু রমাঁ রলাঁ্যাও ক্ষুব্ধ হলেন এই আমন্ত্রণগ্রহণে। কবি নেপল্‌স্‌ হয়ে রোম নগরীতে এলেন। থাকা ও ঘোরাফেরার এলাহি ব্যবস্থা। চৌদ্দ দিন রোমে থাকলেন। একদিন লুকিয়ে দেখা করতে এলেন দার্শনিক বেনেদোত্তে ক্রোচে। তিনি মুসোলিনীর আসল উদ্দেশ্য কবির কাছে ব্যক্ত করলেন।

রোম থেকে ফ্লোরেন্স ও তুরিন হয়ে সুইজারল্যাণ্ডে। সেখানে রমাঁ রলাঁ্যার সঙ্গে দেখা। তিনি কবিকে ইতালির আসল স্বরূপটি ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। কবির মোহ ভাঙল। এনড্রুজকে এক চিঠিতে ইতালি ও মুসোলিনী সম্পর্কে তাঁর পরিবর্তিত মত জানালেন। চিঠিখানি 'মানচেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় ছাপা হয়। সেই চিঠি পড়ে মুসোলিনীর দলবল কবির উপর খাপ্পা হয়ে গালিগালাজ শুরু করলেন। অধ্যাপক তুচ্চি বিশ্বভারতী থেকে সরে এলেন। ফর্মিকি আগেই সরে এসেছেন।

জুরিখ ভিয়েনা ও প্যারিস হয়ে কবি এলেন ইংল্যাণ্ডে। সেখানে প্রথমে এল্‌মহার্স্টের বাড়ি ডেভনশায়রে ডার্টিনটন হলে। সেবার লণ্ডনে

থাকার সময় এপস্টাইন নামক বিশ্বখ্যাত ভাস্করের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি কবির একটি মূর্তি গড়লেন। লণ্ডন থেকে গেলেন নরওয়ের রাজধানী অসলো। সেখানে বক্তৃতা, ভোজ বা পার্টির অন্ত ছিল না। তারপর সুইডেনের রাজধানী স্টকহোম ও ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহাগেন।

এলেন জার্মানির হামবুর্গ। সেখানে বক্তৃতা দেন, বিষয় ছিল—'কালচার অ্যাণ্ড প্রোগ্রেস।' হামবুর্গ থেকে বার্লিন। একদিন জার্মানির প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গের আমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে কবি দেখা করতে যান। একদিন আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গেও দেখা হয়। বার্লিন থেকে মিউনিখ। নুরেনবার্গ কলোন ডুসেলডর্ফ হয়ে এলেন বার্লিন।

ইতিমধ্যে অনেকগুলো গান লেখা হয়ে গিয়েছে। ড্রেসডেনে এলে পর সেখানে জার্মান ভাষায় কবির নাটক 'ডাকঘর' অভিনীত হয়। তারপর চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ শহরে কবি গেলেন। প্রাগ থেকে ভিয়েনা, তারপর হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট। এইখানে বালাতোন হ্রদের পারে বৃক্ষরোপণ করলেন।

কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন বিস্তর ঘোরাঘুরিতে। তবু গেলেন যুগোশ্লাভিয়া, বিপুল সম্বর্ধনা পেলেন বেলগ্রেডে। বেলগ্রেড থেকে বুলগারিয়ার রাজধানী সোফিয়ায় সম্বর্ধনা। সোফিয়া থেকে রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে। সর্বত্র অভ্যর্থনা। বুখারেস্ট থেকে ইস্তাম্বুল, তারপর গ্রীস। আথেন্সের পুরাকীর্তিগুলো দেখলেন।

অবশেষে জাহাজ চলল ঘরের দিকে। বিদেশ সফরে কবি ক্লান্ত। ফেরার পথে গেলেন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া, সেখান থেকে কায়রো। মিউজিয়ামে মমি ও অন্যান্য শিল্পকলা দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি বলেন—"এইসব কীর্তি দেখে মনে মনে ভাবি যে, বাইরে মানুষ সাড়ে তিন হাত, কিন্তু ভিতরে সে কত প্রকাণ্ড।' মিশরের রাজা ফুয়াদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয় কবির। ফুয়াদ বিশ্বভারতীকে প্রচুর মূল্যবান আরবি বই উপহার দেন।

কবি দেশে ফিরেই পেলেন সেই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ দিল্লিতে নিহত। রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে শান্তভাবে সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে চিন্তা করতে বলেন। তিনি শ্রদ্ধানন্দ সম্পর্কে শান্তিনিকেতনে একটি বক্তৃতা দেন।

রাজনীতির উত্তেজনা ধীরে ধীরে কবির মন থেকে মুছে গেল। তখন আবার সৃষ্টিকর্মের দিকে কবি নজর দিলেন। 'নটীর পূজা' নাটক অভিনয়ের পর তিনি লিখলেন নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা। সঙ্গে আছে বৃক্ষবন্দনা। বৃক্ষ ও তরুলতা নিয়ে কাব্য পরে সংকলিত হল 'বনবাণী' নামে। তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের এক শ্রেণীর গান নৃত্যাশ্রয়ী হয়। নটরাজের নৃত্যছন্দ কবির সৃষ্টির মূলে। তাই তিনি লিখতে পারেন 'বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া।'

শান্তিনিকেতনে সুখে দিন কাটাতে না কাটাতেই এল ভরতপুর থেকে মহারাজা কিষণ সিংয়ের নিমন্ত্রণ। সেখানে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে কবিকে সভাপতিত্ব করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ সেখানে গিয়ে ভাষণ দিলেন। সেখান থেকে জয়পুর হয়ে গেলেন আহমেদাবাদে। আবার শিল্পপতি অম্বালাল সরাভাইয়ের বাড়িতে অতিথি। সেখান থেকে আগ্রা হয়ে ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনে। সেখান থেকে কলকাতা। তারপর শিলং। নতুন উপন্যাস লেখা শুরু করলেন সেখানে। প্রথমে নাম হয় 'তিনপুরুষ', পরে 'যোগাযোগ'।

এদিকে আবার এলো বিদেশ যাত্রার ডাক। এবার পশ্চিমে নয়, পূর্বে। ইন্দোনেশিয়া তাঁর বহুদিনের আকর্ষণ। কবির সঙ্গে গেলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ কর, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা এবং ওলন্দাজ সংগীতবিদ আর্‌নল্ড বাকে সস্ত্রীক। জাহাজে প্রথমে সিঙ্গাপুর, তারপর মালয়েশিয়া। সেখান থেকে জাভা ও বালিদ্বীপ। ইন্দোনেশিয়ায় কবিকে মুগ্ধ করল নৃত্য। প্রায় সব কাহিনীই রামায়ণ-মহাভারত থেকে নেওয়া। বালিদ্বীপে ছিলেন কয়েকদিন। যোগ্যকর্তা শহর থেকে গেলেন বিশাল বোরোবুদুর মন্দির দেখতে। আনন্দে কয়েকটা দিন কাটিয়ে গেলেন থাইল্যাণ্ড। ব্যাংককের রাজপরিবার তাঁকে প্রচুর সম্মান দিলেন।

ইন্দোনেশিয়া ছাড়ার পর জাহাজে বসে লিখলেন বিখ্যাত সেই কবিতা— 'সাগরিকা'। তাতে প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রাচীন জাভা-বালির সম্পর্কের কথা যেমন রূপক আকারে আছে, তেমনি বর্তমানে হীনবল ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে একজন কবির আগমনের কথা অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। এবার ইন্দোনেশিয়ায় কবির সঙ্গে গোপনে দেখা

করেন পরবর্তীকালে বিখ্যাত ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ। কবির জাভাযাত্রার আর একটি ফল আমাদের দেশে বাটিক শিল্পের প্রবর্তন। ইন্দোনেশিয়া থেকে সে সময় এটি প্রথমে আনা হয় শান্তিনিকেতনে, তারপর সর্বত্র তা ছড়িয়েছে।

ওদিকে আবার বিলাত যাত্রার ডাক এসেছে। অক্সফোর্ড থেকে হিবার্ট বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ। তাই আবার বিদেশ পাড়ি, পথে মাদ্রাজ। মাদ্রাজ থেকে পণ্ডিচেরি। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা হল। কলম্বো পৌঁছে বিলাত যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করলেন। কেন না, শরীর খারাপ। মহীশূরে গেলেন উপাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের আতিথ্য নিয়ে। সেখানেই 'শেষের কবিতা' নামে নতুন একটি উপন্যাস শেষ করলেন। মাদ্রাজে সিংহলে মহীশূরে দু'মাস কাটিয়ে কবি ফিরলেন শান্তিনিকেতনে।

এই সময় রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে প্রচণ্ড বাদানুবাদ চলছে কলকাতায়। কল্লোল ও কালিকলম নামে দুটি মাসিকপত্র নতুন ধরনের দেহাত্মবাদী সাহিত্য সৃষ্টিতে মন দিয়েছে। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে পুরাতন বলে অস্বীকার করার একটি ভঙ্গীও প্রবল। রবীন্দ্রনাথ তখন 'সাহিত্য ধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে চিরন্তন রসের কথাই সবিস্তারে বললেন। জোড়াসাঁকো বাড়িতে এই নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজনও করা হয়। প্রধান উদ্যোক্তা অপূর্বকুমার চন্দ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। দু'পক্ষের সাহিত্যিকরাই ছিলেন। কবি বলেন,—'যে সমালোচনার মধ্যে শান্তি নেই, যা কেবল আঘাত দেয়, কেবল অপরাধটুকুর প্রতিই সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করে, আমি তাকে ঠিক মনে করিনে।'

শান্তিনিকেতনে ফিরে কবি আবার আশ্রমগুরু। মন স্থির। সেখানে ১৯২৮ সালের ১৪ জুলাই চালু করলেন মরুবিজয়ের কেতন উড়িয়ে বৃক্ষরোপণ উৎসব। বৃক্ষবন্দনা এই উৎসবের মূল সুর। সেই সঙ্গে শ্রীনিকেতনে শুরু হল হলকর্ষণ উৎসব। হলচালনা করলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট বৃক্ষরোপণ উৎসব দেখেই সারা ভারতে পরে চালু হয় 'বনমহোৎসব।' বৃক্ষরোপণ উৎসবে নৃত্যশীলা মেয়েদের শোভাযাত্রা অপূর্ব সুন্দর। এ তিনি নিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার বালিদ্বীপে সেখানকার নৃত্যশীলা মেয়েদের উৎসব সম্ভার নিয়ে শোভাযাত্রা দেখে।
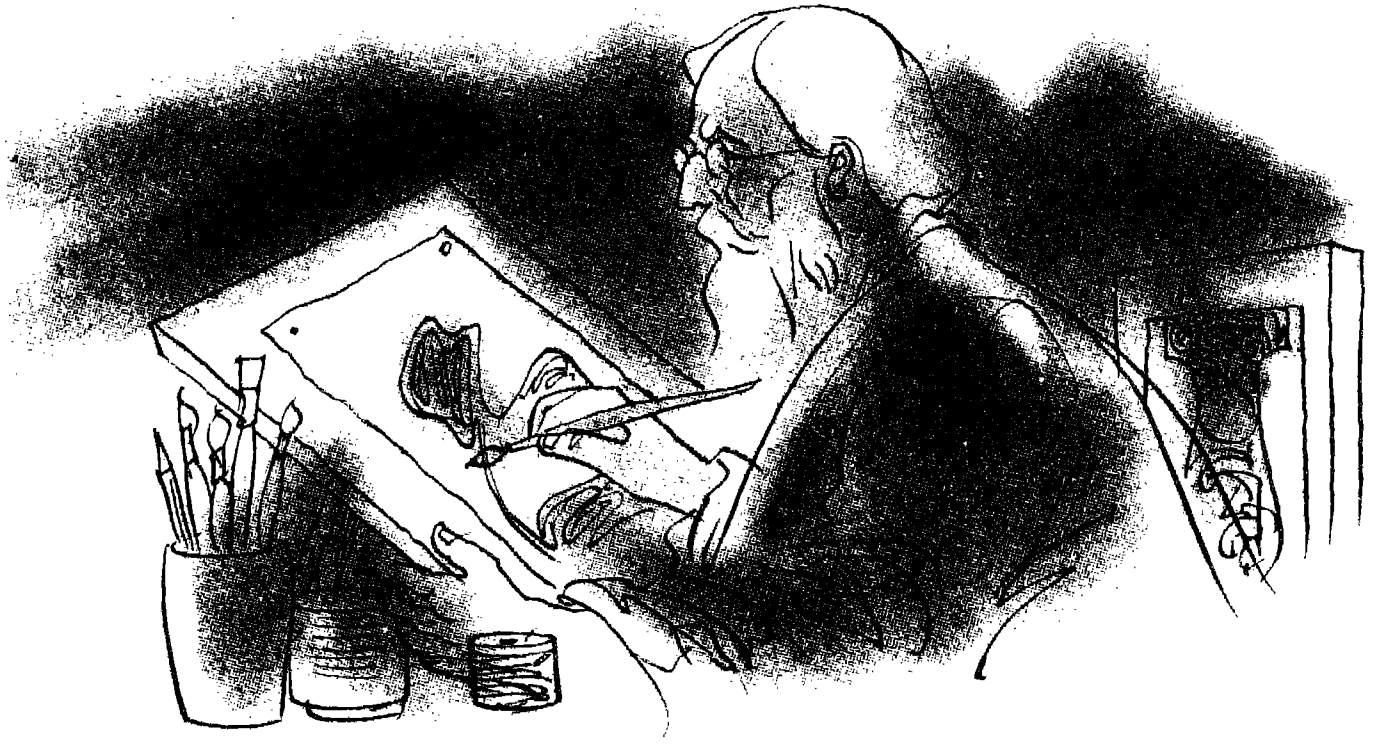
ফিরে এলেন কলকাতায়। তখন ছবি আঁকার নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছে। অবসর সময়ে অনবরত ছবি আঁকেন। একটা চিঠিতে সে সময় লিখছেন—'রেখার মায়াজালে আমার সমস্ত মন জড়িয়ে পড়েছে।' এই সময়েই 'রাজা ও রানী' নাটকটিকে নতুন রূপ দিয়ে করলেন 'তপতী'। তার অভিনয়ের ব্যবস্থাও হল কলকাতায়। তিনি নিজে সাজলেন রাজা বিক্রম। এই 'তপতী' নাটকের মহলার সময় খবর এলো যে ৬৩ দিন অনশনের পর লাহোর জেলে বিপ্লবী যতীন দাশের মৃত্যু হয়েছে। মহলা বন্ধ করে দিয়ে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ, হে ভৈরব, শক্তি দাও।'

বরোদার মহারাজা সয়াজিরাও গায়কোওয়াডের ইচ্ছাতেই কবি আবার গেলেন আহমেদাবাদ। উঠলেন অম্বালাল সরাভাইয়ের বাড়িতেই। সেখান থেকে বরোদা। তিনি রাজঅতিথি। পরম সুখে কয়েকটি দিন কাটিয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। কলকাতা থেকে ১৯৩০ সালে আবার ইউরোপ যাত্রা। প্রধান কাজ অক্সফোর্ডে হিবার্ট লেকচার দেওয়া। আর একটি উদ্দেশ্য ছিল তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী করা।

ফ্রান্সে পৌঁছবার এক মাসের মধ্যেই প্যারিসে কবির চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল। লা পিগাল-এ। আয়োজক আর্জেন্টিনার সেই বিদূষী মহিলা—ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পো। খবর পেয়েই তিনি ছুটে আসেন প্যারিসে এবং তাঁরই চেষ্টায় চিত্রপ্রদর্শনীর সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়। ওকাম্পোর সঙ্গে কবির সেই শেষ দেখা। তবে রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকীতে ব্যুয়েনেস এয়ারিসে ধুমধামের

সঙ্গে উৎসব পালন করান এবং একটি রাস্তার নামকরণ করান রবীন্দ্রনাথের নামে। প্যারিস থেকে কবি গেলেন ইংল্যাণ্ড। লণ্ডন ছুঁয়ে বার্মিংহামের শহরতলি উডব্রুকে। কোয়েকার খৃষ্টানদের এক আশ্রমে।

ওদিকে ভারতবর্ষে গান্ধীজির নেতৃত্বে দ্বিতীয় দফার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। গান্ধীজির এবার দাবি পূর্ণ স্বরাজ। তিনি করলেন সরকারের লবণ আইন ভঙ্গ বিখ্যাত ডাণ্ডি-অভিযান করে। বাঙালি বিপ্লবীরাও সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠ করেছে। তারপরেই ঢাকায় লাগল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। রবীন্দ্রনাথ ইংল্যাণ্ডে থেকেই দেশের সব সংবাদ পেলেন। গান্ধীজির সঙ্গে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও বিদেশের পত্র-পত্রিকায় তিনি পূর্ণ সমর্থন জানালেন এই আইন অমান্য আন্দোলনকে।

অক্সফোর্ডে হিবার্ট লেকচারে কবির বক্তৃতার বিষয় ছিল 'দ্য রিলিজিয়ান অব্ ম্যান'—মানুষের ধর্ম। বক্তৃতার পর ডার্টিংটন হলে এল্‌মহার্স্টের অতিথি হয়ে কিছুদিন থাকার পর কবি গেলেন জার্মানি। ১৯৩০ সালের ১২ জুলাই। জার্মানির পার্লামেণ্ট রাইখস্টাগে জার্মান প্রধানমন্ত্রী ড: ব্রুলিং এবং অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কবির আলাপ হল। তারপর আলোচনা হয় বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে। তাঁর বাড়ি কাপুথে। কবির সঙ্গে সেবারই দীর্ঘ আলাপ হয় ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে। এক্ষেত্রে কবি কথা বলেন বিজ্ঞানীর মত এবং বিজ্ঞানীর কথাবার্তা ছিল কবির মত।

বার্লিনেও কবির চিত্রপ্রদর্শনী হয়। ব্যবস্থা করেন বিদূষী জার্মান মহিলা ড: আনা জেলিগ। এই মহিলা রবীন্দ্রনাথের ডাকে পরে কিছুদিনের জন্য শান্তিনিকেতন এসেছিলেন। বার্লিন থেকে মিউনিখ। অদূরে ওবেরামারগাউ নামক জায়গায় খৃস্টের জীবন নিয়ে 'প্যাশন প্লে' দেখে কবি মুগ্ধ হন এবং তা' নিয়ে দীর্ঘ কবিতা ইংরেজিতে লেখেন 'দ্য চাইল্ড'। আদিতে ইংরেজি ভাষায় লেখা কবির এই একটি মাত্র কবিতা। পরে সেটি বাংলায় রূপান্তরিত করেন 'শিশুতীর্থ' নামে। দশ বছর অন্তর ওই প্যাশন প্লে অনুষ্ঠিত হয়। একজন বাছাই করা লোককে দশবছর শুদ্ধাচারী হয়ে থাকতে হয় এবং তারপর খৃস্টের ভূমিকায় অভিনয় করার অধিকার তার জন্মায়।

মিউনিখ থেকে বার্লিন হয়ে কবি গেলেন ডেনমার্কের এলসিনোর শহরে। সেখানে বক্তৃতা দিয়ে কোপেনহেগেন। এলেন বার্লিন। পরে

জেনিভা। জেনিভাতে থাকতেই এল সোভিয়েত রাশিয়া যাবার নিমন্ত্রণ। প্রধানত উদ্যোক্তা আইনস্টাইন। বছর তিন চার আগে মস্কো যাবার কথা হয়েছিল। যাওয়া হয়নি। এবার তাঁর সঙ্গী হলেন আইনস্টাইন-দুহিতা মার্গট, ড: অমিয় চক্রবর্তী, ড: হ্যারি টিম্বার্স ও আর্যনায়কম। বার্লিন থেকে সোজা মস্কো, রেলপথে।

মস্কো শহরে কবিকে স্বাগত জানালেন অধ্যাপক পেট্রোফ। মস্কোর লেখকগোষ্ঠী কবির জন্য কনসার্টের ব্যবস্থা করলেন। সোভিয়েত আর্টস আকাদেমির সভাপতি অধ্যাপক কোগান, অধ্যক্ষ পিনকেভিচ, মাদাম লিংবিনোব, ফেরা ইনবার ফেদর গ্লাদকোভ প্রভৃতি লেখক ও লেখিকাদের সঙ্গে কবির আলাপ হয়। তারপর পায়োনিয়ার কমিউনে সেখানকার কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে আলাপ করলেন। চাষীদের সঙ্গেও একদিন আলাপ করে তাদের নানা বিষয়ে আগ্রহ দেখে কবি মুগ্ধ হলেন। পরে লিখেছেন—'রাশিয়ায় না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অসমাপ্ত থাকত।'

কবি মস্কোর বিখ্যাত 'কৃষিভবন' দেখতে যান। কয়েকদিন পর কবির চিত্রপ্রদর্শনী হয়। মস্কো আর্ট থিয়েটারে টলস্টয়ের রিজারেকশন ও ব্যালে দেখে আসেন। কবি দু'সপ্তাহ মস্কোতে ছিলেন। পরে এক চিঠিতে বলেন—'এখানে এসে যেটা আমার চোখে ভাল লেগেছে, সে হচ্ছে এই ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এদেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে।' রাশিয়া নিয়ে বিভিন্নজনকে লেখা চিঠি 'রাশিয়ার চিঠি' নাম দিয়ে পরে প্রকাশিত হয়। রাশিয়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা—বিশেষ করে কৃষি ও শিক্ষার—করেও কবি যে দু' একটি ক্ষেত্রে সমালোচনা করেছিলেন সেদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার, এখন বামপন্থী অনেকেই তা স্বীকার করছেন।

মস্কো থেকে আবার বার্লিন। সেখানে থেকে মার্কিন দেশ। নিউইয়র্ক থেকে বস্টন। তারপর নিউ হাভেন। সেখানে ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে। অসুস্থতার জন্য বক্তৃতা দেওয়া হল না। এলেন ফিলাডেলফিয়া হয়ে নিউইয়র্ক, হোটেল বিল্টমোরে বিরাট সম্বর্ধনা দেওয়া হল কবিকে। কবি আমেরিকায় প্রেসিডেণ্ট হুভার-এর সঙ্গে দেখা করলেন। কার্নেগি হলে একটি ভাষণ দিলেন তিনি। বাহাই সম্প্রদায়ের ডাকে জরথুস্ত্র এবং বাহাউল্লা সম্পর্কে

বক্তৃতা দিলেন। সেবারই ঘনিষ্ঠ আলাপ হয় মূক বধির ও অন্ধ হেলেন কেলার নামক এক অসাধারণ বিদূষীর সঙ্গে। আমেরিকাতেও কবির চিত্রপ্রদর্শনী হল। আনন্দ কুমারস্বামী কবির ছবি নিয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। চিন্তাশীল লেখক উইল ডুরাণ্টের সঙ্গে কবির আলাপ হয়। আমেরিকা ছাড়ার ঠিক আগে রুথ ডেনিস নামে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী কয়েকটি রবীন্দ্র-কবিতা নিয়ে একটি নাচের আয়োজন করেন। সেই নাচে যে-টাকা ওঠে, কবি তা নিউইয়র্কের বেকারদের তহবিলে দান করেন।

কবি ফিরে এলেন লণ্ডনে। এখানে তিনি বিশ্বভারতীর জন্যে টাকা জোগাড়ের জন্য উদ্যোগী হন। 'স্পেক্টেটর' পত্রিকার সম্পাদক ইভ্‌লিন রেঞ্চ কবিকে সম্বর্ধনা জানান। এই সভায় জর্জ বার্নার্ড শ' উপস্থিত ছিলেন। কবির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয় নানা বিষয়ে।

ওই সময়ই লণ্ডনে ভারত-ব্রিটিশ সম্পর্ক নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক বসেছে। রবীন্দ্রনাথ 'স্পেক্টেটর' কাগজে গান্ধীজি যাতে বৈঠকে যোগ দেন, তার জন্য আবেদন করে একটি লেখা লেখেন। হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের বিরোধে মিলনের কোন সূত্রই পাওয়া যাচ্ছিল না। কেউ কেউ কবিকে মধ্যস্থতা করার জন্যে অনুরোধ করেন। কিন্তু কবি অনেক ভেবেচিন্তে ও কথাবার্তা বলে বুঝতে পারলেন যে, এ কাজ তাঁর নয়।

ইউরোপ ও আমেরিকা সফর সেরে কবি দেশে ফিরে ভাবছেন এখানেও তিনি সমবায় ভাণ্ডারের সূত্রে সোভিয়েত আদর্শে একটা সঙ্ঘজীবন গড়ে তুলবেন। কিন্তু কোথাও কোন সাড়া পেলেন না। তাই সব ছেড়েছুড়ে গান নিয়ে মেতে রইলেন। গানগুলো নিয়ে 'নবীন' নামে একটি পালা লিখলেন। কবির সত্তর বয়স পূর্ণ হওয়ার সুবাদে জন্মোৎসব হল। কবি বললেন, 'একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে। সে আর কিছু নয়, আমি কবি মাত্র। আমি তত্ত্বজ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞানী, গুরু বা নেতা নই....আমি বিচিত্রের দূত।'

জন্মোৎসবের পর দার্জিলিং ঘুরে এলেন। দেশে শান্তি নেই। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ চলছে। কবি সেই সময়ই 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখলেন—'যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোন বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। যে-দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে-বিভেদ সৃষ্টি করে, সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ।'

শান্তিনিকেতনে ফিরে বিশ্বভারতীর জন্য টাকার সন্ধানে কবি গেলেন ভোপালের রাজদরবারে। আদর আপ্যায়ন যথেষ্ট হল, কিন্তু সেখানে টাকা মিলল না। ফিরে এসে একটি দুঃসংবাদে কবি বিচলিত। মেদিনীপুরের হিজলি জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর রক্ষীরা গুলি চালিয়ে দু'জনকে হত্যা করে। তার প্রতিবাদে কলকাতায় গড়ের মাঠে একটি জনসভায় রবীন্দ্রনাথ নিন্দা করলেন তীব্র ভাষায় এই ঘটনার।

১৯৩১ সালের অক্টোবরে লণ্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজি গিয়েছিলেন। বিলাত থেকে ফেরার পর গান্ধীজিকে বিনা বিচারে জেলে আটক করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ জানালেন একটি বিবৃতি মারফৎ। ওদিকে ভূটান সীমান্তে বক্‌সা দুর্গের রাজবন্দিরা রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালন করে কবিকে যে অভিনন্দনপত্র পাঠান, তা কবির হৃদয় স্পর্শ করে। তিনি, কবিতা লেখেন—'নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন' ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, হিজলি হত্যাকাণ্ডের পর দুঃখ ও বেদনা থেকে তীব্র প্রতিবাদে তিনি লেখেন—'ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে, দয়াহীন সংসারে' ইত্যাদি।

এই সময় বড় ঘটনা কবির ৭০তম জন্মজয়ন্তী পালন। টাউন হলে কবির চিত্রপ্রদর্শনী উদ্বোধন করে জয়ন্তী উৎসব শুরু হয়। কবির সম্বর্ধনার মানপত্রে শরৎচন্দ্রের লেখনীতে দেশবাসীর পক্ষে বলা হয়—'কবিগুরু, তোমার দিকে চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'দ্য গোল্ডেন বুক অব্ টেগোর' নামে প্রশস্তি গ্রন্থ এবং রবীন্দ্র পরিচয় সভার প্রতিনিধিরূপে ক্ষিতিমোহন সেন 'জয়ন্তী উৎসর্গ' নামে বই রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। তার পরদিন ৩১ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে কলকাতার ছাত্রসমাজ কবিকে সম্বর্ধনা জানান। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে উৎসবের অঙ্গ হিসাবেই 'শাপমোচন' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। কবির আঁকা ছবিরও একটি প্রদর্শনী হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার পর কলকাতায় সেই প্রথম।

সাত

খড়দহে কিছুদিন বিশ্রাম নেবার পর আবার ডাক এল বিদেশে পাড়ি দেবার। পারস্যের বাদশাহ্ রেজা শাহ্ পেহল্‌বি'র নিমন্ত্রণ এসেছে। বিমানে চললেন ইরান। প্রথমে বুশায়ার। সেখান থেকে মোটরে সিরাজ—কবি হাফেজ ও সাদীর বাসভূমি। সাতদিন সেখানে থেকে ইস্পাহান। পথে প্রাচীন রাজধানী পার্‌স্ বা পার্সিপোলিস। সেখান থেকে গেলেন এখনকার রাজধানী তেহ্‌রান। বাদশাহ্‌র সঙ্গে দেখা হল। পঁচিশে বৈশাখ পড়ায় ঘটা করে কবির জন্মোৎসব পালন করা হল তেহ্‌রানে।

তেহ্‌রান থেকে মোটরে ইরাক। পথে পড়ল অখামনীয় দারায়ুসের বেহিস্থান শিলালিপি। এলেন বাগদাদ। রাজা ফৈজলের সঙ্গে দেখা হল। রাজধানীতে প্রচুর সম্বর্ধনা পাওয়ার পর গেলেন মরুপ্রান্তরে বেদুয়িনদের তাঁবুতে। তারা কবিকে ভোজ দিল, রণনৃত্য দেখাল। কবি তাদের আপ্যায়নে মুগ্ধ। মনে পড়ল অনেক আগেকার লেখা কবিতার পঙক্তি—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন।' বাগদাদ থেকে কবি বিমানে কলকাতায় ফিরলেন।

ফিরেই পেলেন মৃত্যুশোক। কবির একমাত্র দৌহিত্র, কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর পুত্র নীতিন্দ্রনাথের অকালে মৃত্যু হয় জার্মানিতে। কবি অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকপদে নিয়োগ করে ওই সময়। কবি কমলা বক্তৃতা দেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। শান্তিনিকেতনে ফিরে গদ্যছন্দে কবিতা লেখা শুরু করেন। 'পুনশ্চ' নামে বই বের হল। এই সময় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৫৭ তম জন্মদিনে সম্বর্ধনাদানের ব্যবস্থা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে তাঁর 'কালের যাত্রা' নামে বই শরৎচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। তিনি লেখেন—'কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক। এই আশীর্বাদ-সহ তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করি।'

ওদিকে পুনের যারবেদা জেলে বন্দি গান্ধীজি অনশনরত। বৃটিশ সরকার ইতিপূর্বে হিন্দু ও মুসলমানকে স্বতন্ত্র নির্বাচকগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এবার ঘোষণা করা হল বর্ণহিন্দু আর তপশিলিরা পৃথক। গান্ধীজি জেল থেকে এই সব বিভাগকে অস্বীকার করে আপত্তি জানালেন। প্রতিবাদে তাঁর এই অনশন। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পেয়ে ছুটে গেলেন পুনে। ১৯৩২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। সেদিনই খবর এল বৃটিশ সরকার গান্ধীজির প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। সেই খবর পেয়ে গান্ধীজি অনশনভঙ্গ করলেন। এই অনশনভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথ জেলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি গান্ধীজিকে লেবুর জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে গান্ধীজির অনুরোধে তাঁরই প্রিয় গান 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' গানটি গাইলেন। কয়েকদিন পরেই ২ অক্টোবর। গান্ধীজির জন্মদিন। পুনে শহরে এক বিশাল জনসভায় কবি একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করলেন। তিনি বললেন—দেশবসীকে অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে হবে এবং হিন্দু ও মুসলমান মিলিতভাবে দেশ সেবায় আত্মউৎসর্গ না করলে স্বরাজলাভ সহজসাধ্য হবে না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য গান্ধীজির অনশনের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনের বহু লোক উপবাসী রইলেন। রবীন্দ্রনাথ এই অনশনব্রত সম্পর্কে বলেন—'রাষ্ট্র ব্যাপারে গান্ধীজি যে অহিংসানীতি এতকাল প্রচার করে এসেছেন, আজ তিনি সেই নীতি নিজের প্রাণ দিয়ে সমর্থন করতে উদ্যত। একথা বোঝা অত্যন্ত কঠিন বলে আমি মনে করি না।'

পুনে থেকে কবি ফিরলেন শান্তিনিকেতনে। এবার লিখলেন নতুন বড়গল্প 'দুই বোন।' কলকাতায় যেতে হল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ৭০ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে। উৎসবে সভাপতি হলেন রবীন্দ্রনাথ। কবি কলকাতা থেকে গেলেন বরানগরে, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতে। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন মদনমোহন মালবীয়া। মালবীয়াজী রবীন্দ্রনাথকে বললেন—ভারতে নূতন শাসনব্যবস্থা চালু হবার মুখে ভারতের বিরুদ্ধে বিদেশে কুৎসা রটনা শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারত যে অধিকতর দাবির আযোগ্য, এটাই ব্রিটিশ এজেন্টদের মূলকথা। রবীন্দ্রনাথ বললেন, এই প্রচার প্রতিহত করার জন্যে বিদেশের প্রধান প্রধান শহরে ভারত সম্বন্ধে তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার। খুচরো

প্রবন্ধ লিখে তা রোধ করা সম্ভব নয়।

কবি তারপর দার্জিলিং ঘুরে শান্তিনিকেতনে কিছু দিনের জন্য থিতু হয়ে বসলেন। তার আগে ১৯৩২ সালের ২৯ ডিসেম্বর স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের আমন্ত্রণে সুন্দরবনের গোসাবায় পল্লীউন্নয়ন কেন্দ্র দেখতে যান। কবি মোটর লঞ্চে গিয়ে দু'দিন গোসাবায় ছিলেন। সেখানকার কাজকর্ম দেখে, বিশেষ করে সমবায় প্রথার প্রসার দেখে কবি মুগ্ধ হন।

পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৩ সালের জানুয়ারিতে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। কবি তখন নতুন নাট্যরচনায় মেতে উঠেছেন। নিজের লেখা পুরোনো গল্প বা নাটক ভেঙে নতুন একটা কিছু দাঁড় করাবার কাজে ব্যস্ত ছিলেন আগামী কয়েক বছর। শান্তিনিকেতনে নৃত্যচর্চা বেড়েছে। অনেকেই ভাল নাচতে পারেন। মনিপুর ও কেরল থেকে ভাল ভাল নাচিয়ে এসেছেন শান্তিনিকেতনে নাচ শেখাতে। এই ত্রিশের দশক রবীন্দ্রনাথের নতুন সৃষ্টির যুগ। নৃত্যকলাকে তিনি শিক্ষিত সমাজের কাছে নিয়ে এলেন। একে একে লিখলেন শাপমোচন, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা প্রভৃতি নৃত্যনাট্য এবং 'তাসের দেশ' নামক নাচ-গান-অভিনয়ের অসাধারণ নাটক। নৃত্যলক্ষ্মীকে এমন সম্মান ইতিপূর্বে আর কোন ভারতীয়ই জানাননি। এই নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে কবি সারা ভারত ও শ্রীলঙ্কা ঘুরেছেন।

কবি 'তাসের ঘর' নাটক নিয়ে গেলেন বোম্বাই। বক্তৃতা ও অভিনন্দনের পালাও চলল। সেখান থেকে ওয়ালটেয়ার। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে। বিষয় 'মানুষ'। ওয়ালটেয়ার থেকে নিজামের হায়দরাবাদ। তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেখানকার প্রধানমন্ত্রী স্যার কিষণপ্রসাদ। নিজাম বিশ্বভারতীর ইসলামি বিভাগে গবেষণার জন্য টাকা দিয়ে আসছেন।

দেড়মাস পশ্চিম ভারত ও মধ্যভারতে কাটিয়ে কবি ফিরলেন কলকাতায়। রামমোহন শতবার্ষিক উৎসবে কবি ভাষণ দিলেন 'ভারত পথিক রামমোহন' সম্পর্কে। কবি শান্তিনিকেতনে ফিরলে এলেন সরোজিনী নাইডু। এলেন জওহরলাল নেহরু ও তাঁর স্ত্রী কমলা নেহরু। তাঁদের একমাত্র সন্তান ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী তখন বিশ্বভারতীর ছাত্রী।

কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ জানতে পারেন গান্ধীজি কলকাতায় আসছেন হরিজন আন্দোলনের প্রচারের কাজে। পুনে-চুক্তির ব্যাপারে বাংলার বর্ণহিন্দুরা

গান্ধীজির ওপর বিরক্ত, তাই তাঁরা ঠিক করলেন এবার তাঁরা গান্ধীজিকে স্বাগত জানাবেন না। রবীন্দ্রনাথ এতে ক্ষুণ্ণ হয়ে ঘোষাণা করলেন—'আমি গান্ধীজিকে স্বাগত করছি।' এই সময়ই আবার গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড মতভেদ হয়। অস্পৃশ্যতা পাপের জন্যে বিহারে ভূমিকম্প হয়েছে—গান্ধীজি এই বিবৃতি দেওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ পাল্টা বিবৃতিতে বলেন, একটা বৈজ্ঞানিক বিষয়কে কুসংস্কারের সঙ্গে মেশানো অন্যায়। জওহরলাল রবীন্দ্রনাথের এই মত সমর্থন করেন।

কবি আবার চললেন দক্ষিণ ভারতে। সঙ্গে শাপমোচনের দল। দিন বারো মাদ্রাজে থেকে ওয়ালটেয়ার হয়ে ফিরে এলেন। তারপরই কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গেলেন। যেদিন কবির কাশী রওনা হওয়ার কথা সেদিন অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বাংলার গবর্নর স্যার জন এণ্ডারসনের—যিনি দেশের বিপ্লবীদের দমন করতে সিদ্ধহস্ত—শান্তিনিকেতনে আসা নিয়ে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। লাটসাহেবের নির্বিঘ্নতার দোহাই পেড়ে পুলিশ কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে আটক করতে চান। তাতে কবি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তাহলে আপনারা লাটসাহেবকে স্বাগত জানান, আমি চললাম। শেষ পর্যন্ত গবর্নরের আসার দিন শান্তিনিকেতনে কেউ রইলেন না। সব চলে গেলেন আশেপাশের গ্রামে। লাটসাহেব শূন্য আশ্রম দেখে ফিরে যান। তার কিছুদিন পর কবি কাশী গেলে পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ তো দিলেনই, তাঁকে ডক্টরেট উপাধিও দেওয়া হয়।

কাশী থেকে এলাহাবাদ। সেখান থেকে লাহোর—ছাত্র সম্মেলনের ডাকে। রইলেন দু'সপ্তাহ। তখন পঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ প্রচণ্ডভাবে মাথা চাড়া দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে এক চিঠিতে লিখলেন—'পঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিচ্ছেদের ছবি দেখে এলুম, তা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাজনক এবং লজ্জাকররূপে অসভ্য।'

ইতিমধ্যে ১৯৩৪ সালে 'চার অধ্যায়' নামে বিতর্কিত উপন্যাস বেরিয়েছে। দুই বোন, মালঞ্চ, বাঁশরীর পর কবির শেষ উপন্যাস। বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে। অনেকে বলতে থাকেন সরকারের বিপ্লব দমনের জন্যেই এই বই লেখা হয়েছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন বাংলার

সন্ত্রাসবাদের ভূমিকায় দুটি তরুণ-তরুণীর প্রেমের উন্মেষ ও তার আত্মঘাতী পরিণতি। কিন্তু বাংলার একদল রবীন্দ্রবিরোধী লোক বইটির বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে হাওয়া বিষাক্ত করে তোলেন। কিন্তু অপপ্রচার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

১৯৩৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কবির ৭৪ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সম্বর্ধনা। সেখান থেকে বুদ্ধদেবের জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতায় ধর্মরাজিক চৈত্যবিহারের সভায় কবি হলেন সভাপতি। তাঁর ভাষণে বলেন—'আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি, আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি।'

এই সময়ই ইউরোপের আকাশে যুদ্ধের কালো মেঘ দেখা যাচ্ছিল। জার্মানিতে হিটলারের আবির্ভাবে কবি অত্যন্ত চিন্তিত। 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক ও কবিবন্ধু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের একটি চিঠির উত্তরে কবি লেখেন—'আমার পক্ষে হিটলারের প্রয়োজনই হয় না।' এই সময়ই অর্থাৎ ১৯৩৫ সালে এলেন জাপানি কবি নোগুচি। তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল, কিন্তু এই নোগুচির সঙ্গে পরে কবির বিবাদ ঐতিহাসিক। পরে চীন-জাপান যুদ্ধে তিনি সোজাসুজি দায়ী করলেন জাপানকে এবং জাপানকে সমর্থন করায় তীব্র আঘাত হানলেন নোগুচির ওপর। কিছুদিন পর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লেখেন এবং শতবার্ষিক উৎসবের ধর্মমহাসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

১৯৩৫ সালের ডিসেম্বরে শান্তিনিকেতনে আসেন জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের নেত্রী মার্গারেট স্যাংগার। তার আগে ওয়ার্ধায় গান্ধীজির সঙ্গে এই বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়। গান্ধীজি জন্মনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে মোটামুটি মত দেন। তিনি বলেন জন্মনিয়ন্ত্রণ দরকার, তবে তা ব্রহ্মচর্য ও সংযমের পথে। রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে মত দেন এবং শ্রীমতী স্যাংগারের পথই জন্মনিয়ন্ত্রণের আসল পথ বলে বর্ণনা করেন। তিনি পরে শ্রীমতী স্যাংগারকে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন তা তাঁরই 'বার্থ কন্‌ট্রোল রিভিউ' নামক পত্রিকায় ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির মতো ধর্মনীতির পক্ষে ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাস্তবনীতির দিকে।

রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা নিয়ে উত্তর ভারতের নানা জায়গায় বের হলেন। কারণ বিশ্বভারতীর জন্যে টাকা দরকার। পাটনা, এলাহাবাদ,

লাহোর হয়ে দিল্লিতে এলে পর গান্ধীজির সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়। অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে কথাবার্তা হয় দু'জনে। গান্ধীজি কবির শরীরের অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন। তিনি জানতে চাইলেন, কত টাকা বিশ্বভারতীর দরকার। রবীন্দ্রনাথ বললেন, ঘাটতি ষাট হাজার টাকা। গান্ধীজি জি. ডি. বিড়লাকে বলে সেই টাকা দিয়ে দিলেন এবং বললেন এইভাবে আর ঘুরে বেড়াবেন না। কবি মীরাটে অভিনয় করেই ফিরে এলেন।

শান্তিনিকেতনে এলেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও রাজনীতিবিদ তুলসী গোস্বামী। তাঁরা এসেছেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-নীতির বিরুদ্ধে জনমত উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এক জনসভায় কবিকে বক্তৃতা দেবার অনুরোধ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে ১৯৩৬ সালের ১৫ জুলাই টাউন হলে বক্তৃতা দিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে আতঙ্কিত বর্ণহিন্দুর স্বার্থ বজায় রাখার জন্য ওকালতি করলেন না। বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ন্যায্য পাওনার ওপর 'আরও দাও' দাবির প্রতিবাদ জানালেন না। তিনি বললেন ধর্ম তথা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রতন্ত্র ভারতীয়দের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত।

এসময়ে তিনি পেলেন কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরুর চিঠি। তিনি জানালেন, ভারতের সর্বত্র ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন। সেই জন্মগত অধিকার রাখার জন্য একটি সংঘ গড়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা সেই সংঘের সভাপতি করেছেন।

কিছুকাল থেকে মুসলিম সমাজের একাংশ বাংলা সাহিত্যে পৌত্তলিকতার গন্ধ পাচ্ছিলেন। মুসলমানদের এই সব পড়তে হয় বলেই আপত্তি। 'মোহম্মদী' নামক মাসিক পত্র আপত্তি তুলেছেন রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'পূজারিনী' কবিতার বিষয়বস্তু নিয়ে। তাঁদের মতে এ সবই ইসলাম-বিরোধী। রবীন্দ্রনাথ বাধ্য হয়েই এর প্রতিকার করতে এগিয়ে এলেন। এক প্রতিবাদলিপিতে তিনি জনৈক সমালোচককে বলেন, 'লেখক পাপপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন। আমি সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে তাঁকে এই উপদেশটুকু দেব যে কাব্যে নাটকে পাত্রদের মুখে যে-সব কথা বলানো হয়,

সে কথাগুলিতে কবির কল্পনা প্রকাশ পায়। অধিকাংশ সময়েই কবির মত প্রকাশ পায় না।'

ইতিমধ্যে ১৯৩৭ সালে ইংল্যাণ্ড থেকে অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী কবিকে অনুরোধ করেন আফ্রিকা সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখে দিতে। কেননা লণ্ডনে ইথিওপিয়ার রাজা হাইলে সেলাসি কবির কাছে তা প্রার্থনা করেছেন। কবি তক্ষুণি 'আফ্রিকা' নামে একটি কবিতা লিখে পাঠান। কবিতাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিলে হাইলে সেলাসি খুব খুশি হন। শুধু তাই নয়, উগাণ্ডার রাজকুমার নিয়াবঙ্গো কবিতাটি বাণ্টু ও সোহায়েলি ভাষায় অনুবাদ করিয়ে ব্যাপক প্রচার করেন।

১৯৩৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন। উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে কবি দীক্ষান্ত ভাষণ দিতে কলকাতায় গেলেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলায় ভাষণ পাঠ করলেন। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। সমাবর্তনের পর কবি যান চন্দননগর। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে।

১৯৩৭ সালের ১৪ এপ্রিল 'চীন ভবনের' দ্বারোদ্‌ঘাটন হল শান্তিনিকেতনে। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ 'চীন ও ভারত' নামে একটি ভাষণ পাঠ করেন। এই সময়ই কবি জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর বাংলায় একখানি বই লেখেন, নাম দেন 'বিশ্বপরিচয়'। এরপর কবি বিশ্রাম নিতে গেলেন আলমোড়া।

আলমোড়া থেকে ফেরার পরই কবি তাঁর জমিদারি রাজশাহী জেলার পতিসরে যাওয়া স্থির করলেন। প্রজাদের সে কী উৎসাহ। কবির সঙ্গী সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী এই সফর সম্পর্কে লেখেন—'সাম্প্রদায়িক এই দুর্দিনে পতিসরে মুসলমান-বহুল প্রজামণ্ডলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আসন কোথায়, সেটা চোখে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা যতটা বুঝবেন, চোখে যাঁরা দেখেননি, তাঁদের সে কথা বুঝিয়ে বলা শক্ত হবে।'

রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে বলেন, তাঁর উচিত ছিল প্রজাদের সুখদুঃখের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাকি জীবন কাটানো। কিন্তু বাইরের ডাকে তিনি অন্যত্র অন্যভাবে জীবন কাটিয়েছেন। এখন অসুস্থ শরীরে আর একসঙ্গে এখানে থাকা সম্ভব নয়। প্রজারা, বিশেষ করে

মুসলমান প্রজারা ছলছল চোখে তাঁদের প্রিয় জমিদারমশাইকে নদীতীরে এসে বিদায় দেয়।

পতিসর থেকে ফেরার পর কলকাতার টাউন হলের এক জনসভায় সভাপতি হন কবি। এই সভার উদ্দেশ্য আন্দামানে রাজবন্দীদের অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে জনগণের সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং বাংলার মুসলীম লীগ সরকারের হৃদয়হীন মনোবৃত্তি ও আচরণের প্রতিবাদ জ্ঞাপন। রবীন্দ্রনাথ আন্দামানের বন্দীদের কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে জানালেন, 'বাংলা তার অনশন ধর্মঘটী নির্বাসিত সন্তানদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানার জন্যে ব্যাকুল। দেশ তোমাদের পেছনে আছে।' ১৯৩৭ সালের ১৪ আগস্ট 'আন্দামান দিবস' পালন করা হল বাংলায়। শান্তিনিকেতনেও এই উপলক্ষে সভা ডাকা হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে আধুনিক দণ্ডনীতির মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন বর্বরতা আছে তা বিশ্লেষণ করে বর্তমান রাজনীতির ক্ষেত্রে দণ্ডিতদের প্রতি দণ্ডনীতির অপপ্রয়োগের কথা আলোচনা করেন।

কিছুদিন পরে চিকিৎসার জন্যে এলেন কলকাতায়। ছিলেন বরানগরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতে। তখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন চলছে কলকাতায়। বড় বড় কংগ্রেস নেতারা উপস্থিত। কবি অসুস্থ জেনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান জওহরলাল, সরোজিনী নাইডু, আচার্য কৃপলানি প্রমুখ। মহাত্মা গান্ধীও তাঁর গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু রওনা হবার সময় মোটরগাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়ায় আবার ফিরে যান শরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতে। খবর পেয়ে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ গান্ধীজিকে দেখতে উডবার্ন পার্কে শরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতে আসেন। গান্ধীজি ছিলেন বাড়ির একেবারে ওপর তলায়। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা অসম্ভব। তাই একটি চেয়ারে তাঁকে বসিয়ে চারটি পায়া ধরেন জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র বসু ও মহাদেব দেশাই। এইভাবে তাঁকে ওপরে তুলে গান্ধীজির সামনে উপস্থিত করা হয়। সেখানে গান্ধীজির একটি উপাসনা সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। প্রশান্তচন্দ্রের বাড়িতে বরানগর গুপ্ত নিবাসে একদিন সুভাষচন্দ্র বসু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান। দেশের বর্তমান রাজনীতি নিয়ে দু'জনে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়।

এই সময়ই দেশের জাতীয় সংগীত নিয়ে নানা বিতর্ক দেখা দেয়।

একদল পুরো 'বন্দে মাতরম্' গানের পক্ষপাতী। কিন্তু জওহরলাল প্রমুখ কয়েকজন নেতার মতে পুরো গান ভারতের সর্বজাতির পক্ষে গ্রহণীয় হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথও জওহরলালকে লিখে জানালেন যে সমগ্র গানটি দেশের জাতীয় সংগীত হতে পারে না। কবির এই অভিমতে বাংলাদেশের বহু উগ্র জাতীয়তাবাদী পত্রিকা ও বহু গুণিজন রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেন। কিন্তু কবির অভিমত মত ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত ও রবীন্দ্রনাথকৃত সুর দেওয়া 'বন্দে মাতরম্' কবিতার প্রথম স্তবক কংগ্রেসের অধিবেশনে জাতীয় সংগীত রূপে গৃহীত হয়। তবে কবিরচিত 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি জাতীয় সংগীতরূপে স্বাধীন ভারত বহু তর্কবিতর্কের পর গ্রহণ করে এবং খণ্ডিত 'বন্দে মাতরম্' অন্যতম জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পায়। জনগণমন গানটি সম্পর্কে কেউ কেউ অভিযোগ করেন, গানটি ব্রিটিশ রাজের বন্দনা। এই সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্র সেন লিখিত 'ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত' নামে গ্রন্থখানি সব বির্তকের অবসান ঘটিয়ে 'জনগণমন' গানটি যে কোন মানুষের উদ্দেশ্যে রচিত নয় তা প্রমাণ করেছে।

আট

রাজনীতিবিদদের মধ্যে গান্ধীজি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে কাছের মানুষ। তাঁর সঙ্গে আমৃত্যু হৃদ্যতা ১৯১৫ সাল থেকে। তাছাড়া জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর স্নেহের সম্পর্ক ছিল। ১৯৬১ সালে বোম্বাইয়ে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করতে গিয়ে জওহরলাল বলেন, কর্মসূত্রে আমি গান্ধীজির কাছের লোক হলেও চিন্তাসূত্রে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাঁধা। কথাটা ঠিক, ১৯৩৬ সালে কমলা নেহরুর মৃত্যুসংবাদ শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছলে রবীন্দ্রনাথ একটি শোকসভার আয়োজন করেন এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে জওহরলালকে 'ঋতুরাজ' বলে সম্বোধন করেন। কারণ তিনি নতুন ভারতের নতুন যৌবনের দূত। বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা ভারতের পরবর্তী যোজনা নিয়ে যে খসড়া প্রস্তাব পাঠান রবীন্দ্রনাথের কাছে তার বিশদ আলোচনার জন্যে কবি জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুকে
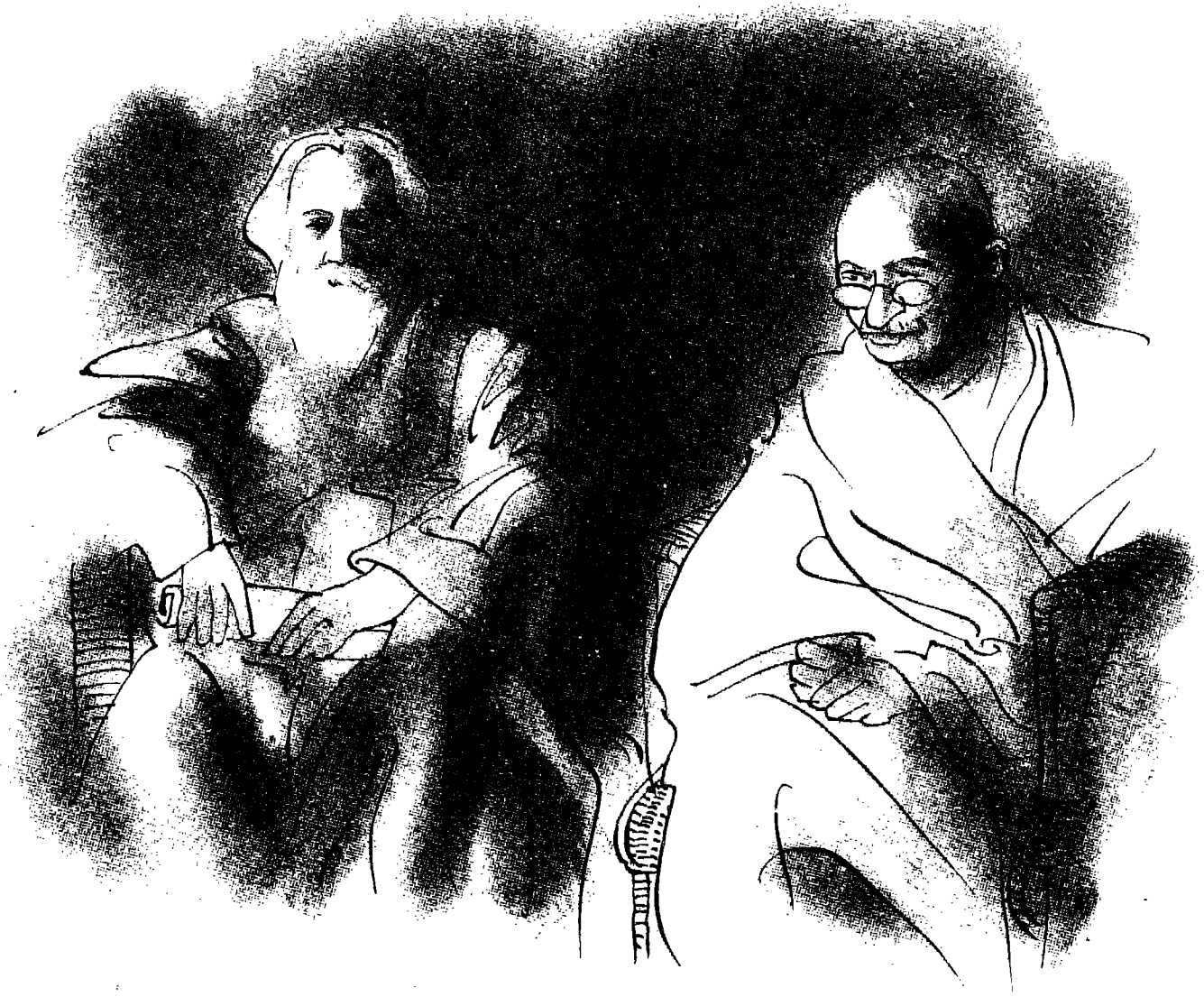
শান্তিনিকেতনে ডেকে পাঠিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৩৯ সালে জওহরলাল যখন চীনে যাওয়া স্থির করেন, তখন পেইচিং যাওয়ার পথে জোড়াসাঁকোয় থেমে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করেন।

সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিলেত থেকে প্রথম যখন সুভাষচন্দ্র কলকাতায় ফেরেন, তখন একই জাহাজে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দেশের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে দু'জনে আলোচনা হয়। তারপর নানা সময়ে নানা ভাবে সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ নেন। শান্তিনিকেতনে যান কয়েকবার। একবার রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আম্রকুঞ্জে অভ্যর্থনা জানান। দেশের ভবিষ্যৎ যোজনা নিয়ে সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করতে শান্তিনিকেতন তো যানই, তাছাড়া সুভাষচন্দ্রকে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি করার জন্যে রবীন্দ্রনাথ জোর চেষ্টা চালিয়ে যান। পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি হবার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্য পদত্যাগ করায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সুভাষচন্দ্র সভাপতি পদে ইস্তফা দেন। সেই

ঘটনায় ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ 'দেশনায়ক' পদবী দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে দেশবাসীর পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দিতে প্রস্তুত হন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'তাসের দেশ' নাটকটি সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন।

যাই হোক, কবি শান্তিনিকেতন থেকেই খবর পেলেন বাংলা সরকার ১১০০ জন বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে। কবি আনন্দিত। তবে সেই সময়ই খবর এল কবিবন্ধু বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়েছে। কবি বিমর্ষ। তার কিছুদিন পরেই এল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ। কবি বিষণ্ণ। এই সময়ই অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে 'হিন্দী ভবন' নামক বাড়ির ও বিভাগের প্রতিষ্ঠা করতে আসেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু।

কবি তারপরেই কালিম্পং গেলেন। সেখান থেকে মংপু—মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্যে। সেবারই নববর্ষের দিন কবির মন আন্তর্জাতিক জটিলতায় ভারাক্রান্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে ইউরোপ জুড়ে। শান্তিনিকেতন থেকে ড: অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে এক চিঠিতে লেখেন—'আমার জীবনের শেষ পর্বে মানুষের ইতিহাস এ কী মহামারীর বিভীষিকা দেখতে দেখতে প্রবল দ্রুত গতিতে সংক্রামিত হয়ে চলেছে। দেখে মন বীভৎসতায় অভিভূত হল। একদিকে কী অমানুষিক স্পর্ধা, আর-এক দিকে কী অমানুষিক কাপুরুষতা। মনুষ্যত্বের দোহাই দেবার কোন বড় আদালত কোথাও দেখতে পাইনে।'

কালিম্পঙে থাকতে থাকতেই মুদ্রিত বিদ্যাসাগর রচনাবলীর প্রথম খণ্ড পেয়ে প্রকাশককে লেখেন—'আমরা সেই ক্ষণজন্মা পুরুষকে শ্রদ্ধা করবার শক্তি দ্বারাই তাঁর স্বদেশবাসীরূপে তাঁর গৌরবের অংশ পাবার অধিকার প্রমাণ করতে পারি। যদি না পারি, তাতে নিজেদের শোচনীয় হীনতার পরিচয় হবে।' কবি যখন কালিম্পঙে, সেই সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব হয়। কবি সেই উপলক্ষে একটি কবিতা লিখে পাঠান, যার প্রথম লাইন—'যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে।'

১৯৩৮ সালের ১৮ নভেম্বরে শান্তিনিকেতন বন্ধ রাখা হয় কামাল আতাতুর্কের মৃত্যু সংবাদ আসাতে। রবীন্দ্রনাথ আতাতুর্ক সম্পর্কে একটি ভাষণ দেন এবং বলেন, 'তিনি তুরস্ককে তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা

দিয়েছেন—সেটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়, তিনি তুরস্ককে তার আত্মনিহিত বিপন্নতা থেকে মুক্ত করেছেন। মুসলমান ধর্মের প্রচণ্ড আবেগের আবর্তমধ্যে দাঁড়িয়ে ধর্মের অন্ধতাকে প্রবলভাবে তিনি অস্বীকার করেছেন।...তুরস্ককে স্বাধীন করেছেন বলে নয়, মূঢ়তা থেকে মুক্তির মন্ত্র দিয়েছেন বলেই কামালের অভাবে আজ সমগ্র এশিয়ার শোক।'

এদিকে কবির রচনা চলছে অবিরাম। নৃত্যনাট্যের প্রযোজনাও চলছে। কেরলের বিখ্যাত কবি বল্লাথোল এলেন শান্তিনিকেতন নাচের দলবল নিয়ে। কবিক নাচ দেখালেন। কয়েকদিন পর কবি গেলেন পুরী বেড়াতে। অনেকগুলো কবিতা লিখলেন সেখানে, পুরী থেকে ফিরেই মংপু। মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে। ১৯৩৯ সালের ১৭ মে থেকে ১৭ জুন একমাস থেকে আবার কলকাতা। তারপর ঐ পথেই ১৯ আগস্ট সুভাষচন্দ্র বসুর অনুরোধে কবি 'মহাজাতি সদন' গৃহের শিলান্যাস করেন। 'মহাজাতি সদন' নামটি কবিরই দেওয়া।

কবি আবার গেলেন মৈত্রেয়ী দেবীর অতিথি হয়ে মংপু। ছিলেন প্রায় দু'মাস। এইসময় ইউরোপে মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। কবি ব্যথিতচিত্তে লিখলেন—'মানুষের জগৎ দেখতে দেখতে ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপরে, ভুলে গিয়েছিলুম সভ্যতার অর্থ ক্রমশই দাঁড়িয়েছে বস্তুব্যবহারের আশ্চর্য নৈপুণ্যে। তার পিছনে অনেক দিন ধরে যে মারাত্মক রিপু বীভৎস হয়ে উঠেছিল, তার সম্বন্ধে লজ্জা ভয় হয়েছে অনভ্যস্ত।'

কবি শন্তিনিকেতনে ফিরে মেদিনীপুরে যান বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করতে। যাবার সময় হাওড়া স্টেশনে রেলের কামরাতেই সুভাষচন্দ্র কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য আলোচনার প্রধান বিষয়। মেদিনীপুরে ভাষণ দিয়ে কবি ফিরে গেলেন শান্তিনিকেতনে। তারপরেই সেখানে পৌষ উৎসব। কবি উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রলয়ংকরতা নিয়ে কথা বলেন। সেবারই ২৫ ডিসেম্বর খৃস্টোৎসবে লেখেন—একদিন যারা মেরেছিল তারে গিয়ে, রাজার দোহাই দিয়ে।

ইতিমধ্যে ১৯৪০ সালে গান্ধীজি এলেন শান্তিনিকেতনে, স্ত্রী কস্তুরবাকে

নিয়ে। সেদিনই, অর্থাৎ ১৭ ফেব্রয়ারি আম্রকুঞ্জে তাঁদের সম্বর্ধনা জানান রবীন্দ্রনাথ। মহাত্মাজি বলেন, শান্তিনিকেতনে এলে তাঁর মনে হয় যেন নিজের বাড়িতেই এসেছেন। সন্ধ্যায় উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণে অতিথি দু'জনের জন্যে 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য অভিনয় হয়। শান্তিনিকেতন দর্শনের পর গান্ধীজি বলেন, 'আমার শান্তিনিকেতন যাত্রা তীর্থযাত্রার মত।'

১৯ ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যাবার সময় রবীন্দ্রনাথ বোলপুর স্টেশনে এসে গান্ধীজির হাতে একখানি বন্ধ খাম দেন। ট্রেন ছাড়ার পর গান্ধীজি দেখেন তাতে লেখা আছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর গান্ধীজি যেন শান্তিনিকেতনের ভার নেন। গান্ধীজি তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, 'আপনি বেঁচে থাকুন শতবৎসর'। বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন নিয়ে ভাবনার দায়িত্ব তিনি সানন্দে নিলেন। গান্ধীজি কলকাতায় ফিরে আবুল কালাম আজাদকে রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি দেখান। জওহরলালকেও। সেই মত কবির মৃত্যুর দশ বছর পর, গান্ধীজির মৃত্যুর তিন বছর পর বিশ্বভারতীর দায়িত্ব নেয় কেন্দ্রীয় সরকার।

রবীন্দ্রনাথ গেলেন সিউড়িতে একটি প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে। সেখান থেকে ফিরে বাঁকুড়ায়। সেখানেও বাঁকুড়া-প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দনের উত্তরে একটি ভাষণও দেন। কিছুদিন পরেই খবর আসে কলকাতার একটি নার্সিং হোমে দীনবন্ধু এনড্রুজের মৃত্যু হয়েছে। কবি বিষাদে ভারাক্রান্ত ধরা গলায় বললেন—'কেবল মনে পড়ে সেই লাল ধুলোয় ধূসর জামাকাপড়, ধুতি খুলে খুলে পড়ছে, কোন মতে সামলে সামলে চলেছেন সন্ন্যাসী।'

কিছুদিন পরেই প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। কবি আরও বিষণ্ণ। কবি তাঁর মৃত্যুর আগে কালিম্পং যাওয়ার পথে কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শেষ দেখা দেখে যান। কালিম্পং থেকে আবার মংপু। কালিম্পং থাকতেই খবর পান তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীনিকেতনের অন্যতম রূপকার কালীমোহন ঘোষও প্রয়াত হয়েছেন।

১৯৪০ সালের ৭ আগস্ট কবিকে অক্সফোর্ডের ডি. লিট. দিতে আসেন ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গয়ার ও সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। তাঁরা আসেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে।

অক্সফোর্ডের রীতি অনুযায়ী মানপত্র লাতিন ভাষায় পাঠ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তর দেন সংস্কৃত ভাষায়।

তার কিছুদিন আগে জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করায়, রবীন্দ্রনাথ এক বিবৃতিতে বলেন, 'এই মহাসংকটের সময়ে যখন কেবলমাত্র কয়েকটি দেশ নহে, পরন্তু সমগ্র সভ্যতাসৌধ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখন ভারতবর্ষের কর্তব্য সুস্পষ্ট। ভারতবর্ষের সমবেদনা পোল্যাণ্ডের পক্ষে।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার পরই ড: অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে আর একখানি চিঠিতে বলছেন—'এই যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা করি। কেননা মানব ইতিহাসে ফ্যাসিজমের, নাৎসিজমের কলঙ্ক-প্রলেপ আর সহ্য হয় না।'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিস্তার কবিকে এক মুহূর্তও শান্তি দিচ্ছে না। হিটলারের সামরিক অগ্রগতি তাঁকে আরও দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। তিনি ১৯৪০ সালের ১৫ জুন কালিম্পং থেকে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়ে বিশ্বব্যাপী সেই তাণ্ডব রোধে একটা কিছু করার আবেদন জানান।

তখন শান্তিনিকেতনে তুলসীদাসের মৃত্যুতিথি উপলক্ষে সভাপতির ভাষণে কবি অনেক কথা বলেন—'তুলসীদাস তাঁর রামচরিতের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন বাল্মীকির রচনা থেকে, কিন্তু সেই উপকরণকে তিনি সম্পূর্ণ নিজের ভক্তিতে রসসমৃদ্ধ করে নতুন করে দান করেছেন। সেইটেই তাঁর নিজস্ব দান। পুরাতনের আবৃত্তি নয়, তাতে তাঁর যথার্থ প্রতিভার প্রকাশ পেয়েছে। তিনি নতুন দৃষ্টি নিয়ে সেই পুরাতন উপকরণকে নতুন রূপ দান করে পরিবেশন করেছেন সমস্ত দেশকে। ভক্তি দ্বারা যে ব্যাখ্যায় তিনি রামায়ণকে নতুন পরিণতি দিয়েছেন, সেটা সাহিত্যে আসাধারণ দান।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ সফরে বেরোলেন ১৯৪০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। গন্তব্যস্থল কালিম্পং। কবিতাও লেখা চলছে। হঠাৎ কালিম্পঙেই হলেন গুরুতর অসুস্থ। অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সঙ্গে আছেন শুধু প্রতিমা দেবী। তিনি অসহায় বোধ করেন। রথীন্দ্রনাথ জমিদারিতে। তাঁকে তার করা হল। প্রতিমা দেবী টেলিফোনে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও অনিলকুমার চন্দকে সংবাদটি পাঠালেন। প্রশান্তচন্দ্র কলকাতার তিনজন বড় ডাক্তার নিয়ে গেলেন। শান্তিনিকেতন থেকে ছুটলেন অনিলকুমার চন্দ, সুরেন্দ্রনাথ

কর ও সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। রথীন্দ্রনাথও খবর পেয়ে ছুটে এলেন।

কলকাতায় আসার পর কবিকে সুস্থ করে তোলা হল। খবর পেয়েই গান্ধীজি তাঁর সচিব মহাদেব দেশাইকে পাঠালেন কবির খবর নিতে। প্রতিমা দেবী লিখছেন—'মহাদেব দেশাই, অনিলকুমারের সঙ্গে বাবামশায়ের ঘরে এসে মহাত্মাজির সহানুভূতি, আন্তরিক প্রেম ও প্রীতি জানালেন। অনিলকুমার চন্দ জোরে জোরে মহাদেব দেশাই মহাশয়ের বার্তা গুরুদেবকে বুঝিয়ে দিলেন। কেননা, তখন তিনি ভালো করে শুনতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। চোখের জল তাঁর এই প্রথম দেখলুম। নার্ভের ওপর এত বেশি সংযম তাঁর ছিল যে অতি বড়ো শোকেও তাঁকে কখনও বিচলিত হতে দেখিনি। আজ যেন বাঁধ ভেঙে গেল।'

শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। তখন 'রোগশয্যায়' গ্রন্থের কবিতাগুলি লিখছেন। তারপর লিখলেন 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের কবিতা। এই সময়ই চীন থেকে একটি শুভেচ্ছা মিশন আসে। তাই-চি-তাও দলনেতা। কবি রোগশয্যা থেকে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি তাঁদের দুঃখে নিজেকে পীড়িত বোধ করেন। তাঁদের বীরত্বে আশার আলো দেখতে পান। ভারত ও চীনের ক্ষেমধর্মের আদর্শে কবির গভীর শ্রদ্ধা। তাই তাঁর আশা, একদিন চীন তার সেই চিরন্তন প্রাচীন শান্তিকে আবার পৃথিবীতে স্থাপন করবে।

কবি রোগশয্যাতে মুখে মুখে গল্প বলেন, কবিতা বলেন, সেগুলি টুকে রাখা হয়। 'গল্পসল্প' বইয়ে তিনি বলেন—

সাঙ্গ হয়ে এল পালা
নাট্যশেষের দীপের মালা
    নিভে নিভে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে,
রঙিন ছবির দৃশ্যরেখা
ঝাপসা চোখে যায় না দেখা
    আলোর চেয়ে ধোঁয়া উঠছে জমে।

শেষ ক'মাস কাটে রোগাক্রান্ত জীবন নিয়ে। তারই মধ্যে নাতি সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে লেখেন মানুষের জয়গান নিয়ে মৌলিক শেষ গান—'ওই মহামানব আসে'। শেষ জন্মদিনে গানটি গাওয়া হয়। ওই জন্মদিনেই পুরোনো কবিতা ভেঙে নতুন গান লেখা ও গাওয়া হয়—

'হে নূতন দেখা দিক আরবার।' সেই জন্মোৎসবে পড়া হয় তাঁর শেষ ভাষণ—সভ্যতার সংকট। তিনি ভাষণের এক জায়গায় বলেন—'ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে!' তিনি এই ভাষণেই আরও বলেন, 'আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি, পিছনের ঘাটে কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।'

শেষ জন্মদিনের কয়েকদিন পরেই ত্রিপুরা রাজদরবার থেকে মহারাজা ও পার্ষদরা আসেন শান্তিনিকেতনে 'ভারত ভাস্কর' উপাধি দিতে। কবি-জীবনের শুরুতে 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যের জন্য ত্রিপুরার রাজদরবার থেকে সম্মান জানানো হয়েছিল, জীবনের শেষ প্রান্তে আবার শেষ সম্মান ওই ত্রিপুরার রাজদরবার থেকেই। ঘোষণা বাণীতেই বলা হয়—'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনায় অঙ্কুরোদ্গত সেই অমরজ্যোতিঃপ্রকাশ এ রাজ্যের তদানীন্তন অধীশ্বর, এ পক্ষের প্রপিতামহ গুণী রসিক মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরকে আকর্ষণ করায় তিনিই তরুণ রবিকে রাজ-অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।'

প্রায় ওই সময়ই কবিকে এক বিদেশিনীর ভারতের প্রতি উদ্ধত ও অপমানজনক উক্তির প্রতিবাদ করতে হয়। মিস্ রাথবোন নামে এক ইংরেজ মহিলা ভারতের নিন্দা করে এক খোলা চিঠি লিখেছিলেন। মহিলাটির চিঠির মূল বক্তব্য হচ্ছে, ভারতীয়েরা ইংরেজদের দ্বারা পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়ে উন্নত। কিন্তু আজ ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধে সহায়তা করতে গররাজি—এটা অকৃতজ্ঞতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। কবি রোগশয্যা থেকে এক পাল্টা বিবৃতি দেন, যা ভারতের প্রায় সব কাগজেই ছাপা হয়। ওই বিবৃতির এক জায়গায় তিনি বলেন, আমাদের দেশের টাকার থলি দুই শতক ধরে শক্ত করে ধরে যে ব্রিটিশ জাতি আমাদের ধন-দৌলত শোষণ করছে, তারা আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্যে কী করেছে? চারদিকে চেয়ে দেখুন, অনশনশীর্ণ লোকেরা অন্নের জন্যে কাঁদছে। আমি গ্রামের মেয়েদের কয়েক ফোঁটা জলের জন্যে কাদা খুঁড়তে দেখেছি। কেননা ভারতের গ্রামে পাঠশালা থেকেও কুয়ো বিরল। আমি জানি যে ইংল্যাণ্ডের লোক আজ দুর্ভিক্ষের

দ্বারে উপস্থিত। আমি তাদের জন্যে ব্যথিত। কিন্তু যখন দেখি যে খাদ্যসম্ভারপূর্ণ জাহাজগুলিকে পাহারা দিয়ে ইংল্যাণ্ডের উপকূলে পৌঁছে দেবার জন্যে ব্রিটিশ নৌবহরের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা হচ্ছে, এবং যখন এমন অবস্থাও মনে পড়ে যে, এদেশের একটা জেলার লোক অনাহারে মরছে, অথচ পাশের জেলা থেকে এক গাড়ি খাবারও তাদের কাছে পৌঁছতে দেখিনা, তখন আমি বিলাতের ইংরেজ এবং ভারতের ইংরেজদের মধ্যে একটা পার্থক্য না দেখে থাকতে পারিনা।'

মিস্ রাথবোনের কটূক্তিগুলো প্রধানত জওহরলালকে উদ্দেশ্য করে লেখা। তিনি সে সময় জেলে থাকায় প্রতিবাদ জানাতে হয় কবিকে তাঁর রোগশয্যা থেকেই। রবীন্দ্রনাথের এই পাল্টা বিবৃতি দেশবাসীকে নতুন প্রেরণা দেয়।

এদিকে কবির শরীর দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে। এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি কবিরাজি—কোন চিকিৎসাতেই কোন উপকার পাওয়া যাচ্ছে না। শেষমেষ ঠিক হয় অপারেশন হবে কলকাতায়। করবেন ডা: ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪১ সালের ২৫ জুলাই কবিকে আনা হল কলকাতায়। পরীক্ষা করলেন ডা: নীলরতন সরকার ও ডা: বিধানচন্দ্র রায়। ৩০ জুলাই হল অপারেশন। অপারেশনের দিন সকালবেলা মুখে মুখে বলেছেন একটি কবিতা—শেষ কবিতা—'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি, বিচিত্র ছলনাজালে, হে ছলনাময়ী—।'

অপারেশনের দু'তিন দিন পর শরীরের অবস্থা মন্দের দিকে যায়। তারপর সূর্যাস্ত—১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট, দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে। নিমতলা মহাশ্মশানে সেদিনই নশ্বর দেহের পরিসমাপ্তি। মহাকবির মহানির্বাণ। □